মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় -অনূদিত
আরো কবিতার বই :

চেশোয়াভ মিউশ : শ্রেষ্ঠ কবিতা
কবিতা যারা পড়ে না তাদের জন্য কবিতা
—হান্স মাগনুস এন্‌ৎসেন্সবারগার
অর্থহীনতা ও সুখ—পেটার হান্‌ট্‌কে
ভাবুকবাবু—জ্‌বিগ্‌নিয়েভ হেরবের্ট
ইয়েশি হারাসিমোভিচের কবিতা
দেশে ফেরার খাতা—এমে সেজেয়ার
(দেবলীনা ঘোষ-সহযোগে)

মিরোস্লাভ হোলুবের শ্রেষ্ঠ কবিতা

অনুবাদ :
মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

দে'জ পাবলিশিং : কলকাতা

প্রকাশ : ২৫ বৈশাখ ১৩৫৯

প্রকাশক :
সুধাংশুশেখর দে / দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট / কলকাতা ৭৩

মুদ্রক : শিবনাথ পাল / প্রিণ্টেক
২ গণেন্দ্র মিত্র লেন / কলকাতা ৪

অনুবাদকের উৎসর্গ

শ্রী নরেশ গুহ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

সূচি

আমেরিকা

আমেরিকা ১১ লঙ আইল্যাণ্ডে রাত্রি ১২ রাত সাড়ে-এগারোটা, ফার রকঅ্যাওয়ে ১২ অ্যাটলাণ্টিক পাড়ি ১৩ রকেফেলার সেনটার ১৪ পার্ক অ্যাভিনিউ ১৫ জার্সি সিটি ১৫ পাতাল-রেলের স্টেশন ১৬ দেবায়তন ১৭ ব্রুকলিন গোরস্থান ১৮ প'ড়ে-পাওয়া কবিতা : শিরোনাম ১৯ মধ্যপ্রাচ্যবিতর্ক, নিউ-ইয়র্ক ১৯ রাক্ষসতত্ত্ব ২১ দুই ২২ কংক্রিট ২৩ ভাঁড়েরা ২৪ এক মৃত ভাষার পাঠ্যপুস্তক ২৪ পাঠ ২৫ আবিষ্কার ২৬ পোলোনিয়াস ২৭ 'সামান্য উষ্ণতাওলা উত্তাপ' ২৯ আর্কিমিডিসকে খুন করেছিলো যে-করপোর্যাল ৩০ নেপোলিযান ৩০ নৈশভোজ ৩১ প্রাহা, জানুয়ারি ৩২

সিনডেরেল্লা

মাকড়শার মতো কিছু-একটার উড়াল ৩৫ স্তব্ধতার শারীবসংস্থান ৩৮ শিরোনামবিহীন ৪০ গ্রহ ৪১ বুলফাইট ৪২ আরিযাদ্‌নে ৪৩ দুর্গ ৪৫ দৈববাণী ৪৫ সিনডেরেল্লা ৪৬ কবিতা প্রকৌশলবিদ্যা ৪৮ ডেডেলাস বিষয়ে ৪৯ মানুষের ভূ-বিদ্যা ৫১ কাচের বোয়মের মধ্যে ৫২ নবজাতক ৫৩ বাড়িতে ৫৩ কয়েকজন ভারি চালাক-চতুর লোক ৫৪ গীতিকবিতার মেজাজ ৫৫ শিক্ষক ৫৬ সক্রেটিস ৫৬ গালিলেও গালিলেই ৫৮ যুবরাজ হ্যামলেটের দুধদাঁত ৬০ ওলসানির য়িহুদি গোরস্থান, কাফকার কবর এপ্রিল, রৌদ্রোজ্জ্বল ৬২

যদিও

যদিও কবিতা জেগে ওঠে তখন ৬৫ কত্তাদাদামশাই : কবিতার অর্থ ৬৬ যদিও কবিতা হ'লো নিতান্তই এক ছোটো শব্দযন্ত্র ৬৭ La Durée Créatrice ৬৮ শূন্যতার সীমা ৬৯ রোববার সকালের শারীরসংস্থান ৭০ শূন্যতা কখনো বিপর্যয় বা বন্যার মতো ৭১ মৌলিক পদার্থের সঙ্গে অম্লজানের মিশ্র ৭২ আর শূন্যতা শুধু কোনো-একজন লোকেরই ৭৪ সম্মিলিত গৃহস্থালি বীমাসংস্থা ৭৫ আমি মোটেই মনে করি না ৭৬ বিস্ফোরণ ৭৮ স্বাধীনতা নয় শূন্যতার কাছে প্রত্যাবর্তন ৭৯ আগুন

আবিষ্কার ৮০ সন্দেহ নেই, কবিতা নেহাৎই এক খেলা ৮২ আমরা, যারা হেসেছিলুম ৮৩

অণুচিন্তা

অণুচিন্তা বিষয়ে অণুচিন্তা ৮৭ সারূপ্য বিষয়ে ৮৭ রং বিষয়ে ৮৮ শার্লমেন বিষয়ে ৯০ পোকামাকড় বিষয়ে ৯০ গাভী বিষয়ে ৯১ বামনদের বিষয়ে ৯২ নির্ভুলতা বিষয়ে ৯৩ গাছে বিড়াল গজায় এই তত্ত্ব বিষয়ে ৯৪ মানচিত্র বিষয়ে ৯৬ আপেক্ষিকতার তত্ত্ব বিষয়ে ৯৭ বেদনা এই কথাটি বিষয়ে ৯৭ শৈশব বিষয়ে ৯৮ এক বুড়ি আর তার গাড়ি বিষয়ে ৯৯ জ্যাক বিষয়ে ১০০ সূর্য বিষয়ে ১০১ গারুগয়েল বিষয়ে ১০২ চোখ বিষয়ে ১০৪ বেড়া বিষয়ে ১০৫ বড়োদিনের রোহিতনিধন বিষয়ে ১০৬ হাস্য বিষযক ১০৭ প্লাবন বিষয়ে ১০৮ ফাটল বিষয়ে ১০৯ পরীক্ষানল বিষয়ে ১১০ আলোক বিষয়ে ১১২ অর্থ বিষয়ে ১১৩ ব্যঞ্জনবর্ণ ম বিষয়ে অতীব ক্ষুদ্র চিন্তা ১১৩

কার কী উৎস

পাথরের উৎস বিষয়ে ১১৭ মেঘেদের উৎস বিষয়ে ১১৭ ফুটবলের উৎস বিষয়ে ১১৮ কোনো বাষ্পর উৎস বিষযে ১১৯ চিন্তা ১২০ ভিতরযাত্রা ১২১ কড়িকাঠের উৎস বিষয়ে ১২২ উদ্‌জানের মধ্যে অম্লজানজারিত পদার্থের প্রাদুর্ভাব বিষয়ে ১২৩ ভাঁড়েরা ১২৪ সন্ধে ছ-টার উৎস বিষয়ে ১২৪ কবিদের অমরতা বিষয়ে ১২৭ দেখা-সাক্ষাতের তত্ত্বকথা ১২৭ বাড়ি-থাকা ১২৮ পিতৃত্বের উৎস বিষয়ে ১২৮ বিপরীতের উৎস বিষয়ে ১২৯ আইনের শক্তির উৎস বিষয়ে ১৩০ কী অবস্থা তার প্রতিবেদন ১৩১ জঙ্গলের মধ্যে কথাবার্তা ১৩২ মাটির পায়রার উৎস বিষয়ে ১৩৪

মিনোটার

কবিতা সম্বন্ধে মিনোটারের চিন্তা ১৩৯ মিনোটারের নিঃসঙ্গতা ১৪০ মিনোটার, নির্মাতা ১৪০ প্রেম সম্বন্ধে মিনোটার ১৪২ গোলকধাঁধার কৃতী যুবা ১৪৪ ডেডেলাস ১৪৫ সিসিফাস ১৪৭ মিনোটারের কুলুজি সম্বন্ধে ১৪৭ গোলকধাঁধা সম্বন্ধে মিনোটারের চিন্তা ১৪৮ কবির সঙ্গে মুখোমুখি ১৫০

রক্ষাকবচ

রক্ষাকবচ ১৫৩

আ | মে | রি | কা

হোলুব শ্রেষ্ঠ ১

আমেরিকা

একটা পিয়ানো ছুটে চলেছে
মাত্রাছাড়ানো বেগে
রাতের বিতান ধ'রে

সোজা গিয়ে ধাক্কা খায়
আইল্যাণ্ড পার্কের কাচের সিন্দুকে
ভেঙে চুরমার
আর মাইলফলকগুলোর গায়ে জাপটে থাকে
স্বর কোমল-ঋষভ
কোমল-ধৈবত
কোমল-গান্ধার।

কালো মেয়েটির
সিন্ধু আনন
নুয়ে পড়ে আমাদের ওপর,
পিয়ানোর রক্ত ঝ'রে চলে ক্ষীণ-এক
অস্ফুট সুরেলা ধ্বনিতে—

আমেরিকা

কিন্তু তুমি তা প্রমাণ করতে পারবে তো?

লণ্ড আইল্যাণ্ডে রাত্রি

যেন বাদুড়ের মড়ক লেগেছে
এমনভাবে রাত ঝাপট মারে গাছের ডালে।
জেলিমাছের মতো বাড়িগুলো ভাসে
ম্যাগনোলিয়া বুলভার ধ'রে।

আমরা উলটো-পৃথিবীর জীব।
আমরা হাতে হাঁটি।

স্বয়ংক্রিয় ঝাঁঝরিরা
উঠোনে জল ছিটোয়,
যেন পৃথিবী এখনো আছে।

কিন্তু এটা তো মাত্র পৃথিবীর এক স্বতঃসিদ্ধ জমি।
স্বতঃসিদ্ধ বাড়ি
জানলায় চোখের জল।

রাত সাড়ে-এগারোটা, ফার রকঅ্যাওয়ে

মোড়ের কাছে একটি ষাঁড় ফেটে পড়ে
গ'র্জে জানাতে
জগতের অবস্থা, বয়েস।

মোড়ের কাছে এক কালো মেয়ে যায়
শাদা পোশাকে—
যেন
শুভ্রতাই।

'মোড়ের কাছে এক রক্তরাঙা চাঁদ
সমুদ্রকে মাই দেয়।

আর দূরে শেষ বাস
ছেড়ে দেয়,
অতএব এখন কিছুই নেই
যা থেকে তুমি

চ'লে যেতে পারো।

অ্যাটলান্টিক পাড়ি

ব্যাপারটা কেমন যেন অপ্রতিভ আর অস্বস্তিকর
কিন্তু তখনও যে বড্ড-বেশি জল ছিলো
ছিলো বড্ড-বেশি হাওয়া
আর বড্ড-বেশি অসীম
ঠিক রেলিংটাকে পেরিয়েই।

লবণাক্ত দ্রবত্বের মধ্যে
ঢেউ ঢেউ আর ঢেউযে তোলপাড
(ঢেউ আর ঢেউ আর ঢেউ)
পুরাতন-সন্ধির এক চাষা দেখা দেয়
সন্ধেবেলায় আর চাষ ক'রে যায়
হালদেয়া জমির পর জমি।
আর দূরে চারপাশে
আকাশ আর সমুদ্রের মধ্যকার বিপন্ন ফাটলের মধ্যে
একমাত্র বীজ ছিলো
জাহাজ, আর আমাদের
ধীরে-সুস্থে চিবিয়ে-খাওয়া হৃদয়।

আর আমরা যেটা করতে পারি তা শুধু
কোনোমতে আঁকড়ে-ঝোলা
সময়ের সূচনা থেকে
তার সংহার পর্যন্ত
যদিও ব্যাপারটা
সত্যি ভারি অপ্রতিভ আর অস্বস্তিকর।

রকেফেলার সেনটার

এক তাজ্জব বুড়ো যার মনে হয় সবাই তার পেছনে লাগছে
/আচ্ছা, ওয়াল্ট হুইটম্যান সম্বন্ধে
আপনার কী মনে হয় ? /
ফিফ্থ অ্যাভিনিউয়ে রাস্তা পেরোয়
আলো যখন লাল
আর বেশ শান্তভাবেই শাপ দিতে-দিতে
শান্তভাবেই গুনগুন করতে-করতে
পায়েচলার রাস্তা দিয়ে এগুতে থাকে
মার্বেলের আস্তরের ওপর পা ফেলে দাঁড়ায়
আর হেঁটে যায় সমকোণে,
দেমাকে সটান, আনুভূমিক,
হেঁটে যায় সমকোণে,
কোনো জানলার দিকে না-তাকিয়ে,
হেঁটে যায় সমকোণে,
আটষট্টি তলার ওপর,
হেঁটে যায় সমকোণে

আর নীল মেঘমণ্ডলে যে-নাটক হচ্ছিলো তা
তাকে আলতোভাবে হাতছানি দিয়ে ডাকে আর একটা খিস্তি ক'রে
উধাও হ'য়ে যায়, সব কবিতাকে
দারুণভাবে হাঁপ ছেড়ে বাঁচার সুযোগ দিয়ে।

পার্ক অ্যাভিনিউ

যদি নগরী তার বাসিন্দাদের ওপর
শাসন চালায়,   তবে
কী আর ক্ষতি, বেশ ভালোই তো,   কারণ কেবল জৈব পদার্থই
গ'লে-প'চে হেজে যায়,   উদ্‌জানের গন্ধকমিশ্রের
বুড়বুড়ি তুলে।   যে-কালে কোনো পাথরের মৃত্যু
হ'য়ে যায় কোনো মেঘ   আর সমান্তরালের জ্যামিতি
হ'য়ে ওঠে অসীমের   একমাত্র আশা।

একটা লাল-শাদা-নীল   হেলিকপ্টার
নেমে আসে প্যান-অ্যামের ওপর,   আই-বি-এম কম্পিউটারগুলো
বিলি ক'রে যায়   খাঁটি জাতের চৈতন্যপ্রবাহ,
ফার্স্ট ন্যাশনাল সিটি ব্যাঙ্কের সিন্দুকগুলো   ওজন করে
তাদের টন-টন ভারি স্বপ্নগুলো   আর সীগ্রামের ফোয়ারাগুলো
অমায়িকভাবে প্রেম ক'রে যায়।   ব্রন্‌জ আছড়ে পড়ে ওপরমুখো
নিরাপদেই।

দশহাজার কাচের চোখ   দেখতে থাকে,
দেখার   মারাত্মক হতাশায়
না-ভুগেই।

জার্সি সিটি

কোনো নগরীর সংকটমুহূর্ত।
মৃগীরোগের খিঁচুনিতে এলোমেলো
কারখানাগুলো ঘুরে বেড়ায় পোড়োজমিতে।
ধূমায়িত বহ্নিমান শকুনগুলো
আঁচড়ে-আঁচড়ে বার ক'রে আনে পথচারীদের যকৃৎ।

দুর্গন্ধছেটানো মেঘে-মেঘে ডুবে-যাওয়া
দেয়ালগুলোয় ধাক্কাধাক্কির শব্দ ;
মঙ্গলগ্রহের জীবরা সেই-যে কত বছর আগে
টাইমবোমা ফেলেছিলো, তার বিস্ফোরণ
প্রত্যাশিত।

চলি। বিদায়।

আমি শৈশবের জন্য অপরাধী।
আমার সারা পৃথিবী ঘুরে আসার জন্য
যে-ঘড়িটা ঠাকুমা তুলে রেখেছিলেন,
সেটা আমি হারিয়ে ফেলেছি।

পাতাল-রেলের স্টেশন

আজ সন্ধ্যায় মিস্টার হাওয়ার্ড টি. লুইস,
ঠিকানা অজ্ঞাত, বিষণ্ণ আর অবসন্ন,
পরনে ছাইরঙা ওভারকোট আর বাদামি টুপি,
ক্যানাব্রসি লাইনের বি-এম-টি ধরবেন ব'লে ঠিক ক'রে,
দেখতে পেলেন এইট্‌থ অ্যাভিনিউয়ের শেষ স্টেশনে
একজনকে পরনে ছাইরঙা ওভারকোট আর বাদামি টুপি,
যার মুখ বিষণ্ণ আর অবসন্ন
মিস্টার হাওয়ার্ড টি. লুইসের মুখ,
এদিকে বেড়ার পাশে ফাঁকা প্ল্যাটফর্মে
দাঁড়িয়েছিলো এক লোক, ছাইরঙা ওভারকোট গায়ে, মুখচোখ বিষণ্ণ,
যার মুখ হাওয়ার্ড টি. লুইসেরই মুখ আর চুপচাপ তাকিয়েছিলো
নোংরা সিঁড়িগুলোর তলায় সেগুলো বেয়ে উঠে এলো
বাদামি টুপি-পরা এক লোক, বিষণ্ণ আর অবসন্ন,
এমন-একটা মুখ নিয়ে যেটা হাওয়ার্ড টি. লুইসেরই মুখ।

আর তারপর ঘোরানো দরজার
জীর্ণ কাঠের গরাদের মধ্য দিয়ে এলো এক স্ত্রীলোক, বিষণ্ণ আর অবসন্ন,

ঠিকানা অজ্ঞাত,   হাতে বটুয়া   মাথায় বাদামি
টুপি যার মুখটা
সব পুরুষেরই মুখের মতো   আর, অতএব, হাওয়ার্ড টি. লুইসেরও আর
দূরে পায়ের শব্দ   আর কাচের ওপর ঘাবড়ে-যাওয়া সন্তর্পণ পায়ের শব্দ
পায়ের শব্দ   সেই-তাদের যাদের শরীর নোয়ানো আবছায়ায়
আর আলোয় ফ্যাকাশে   এ-সব পায়ের শব্দই
হাওয়ার্ড টি. লুইসের   কোন্ অজ্ঞাত ঠিকানা থেকে
কোন্ অজ্ঞাত ঠিকানার উদ্দেশে,   মাঝে-মাঝে
ঘোরানো দরজা ঘুরে যায় আবার   এমন আওয়াজ ক'রে
যেন কোনো ঝুড়িতে পড়লো গিয়ে কারু মাথা,   কিংবা বেড়ার ওপাশে
দেখা যায় এক মানুষ   সে স্ত্রী নয় পুরুষ নয় আর
তার কোনো ঠিকানা নেই,   কিন্তু তাছাড়া হুবহু একেবারে
হাওয়ার্ড টি. লুইসের মতো,   পায়ের শব্দ   শোনা যায়,
মাথাগুলো, গরাদগুলো, দূরত্ব, আলো আর সুড়ঙ্গ
সবকিছু চুষে খেয়েছে এই চিহ্ন এইট্‌থ অ্যাভিনিউ এইট্‌থ অ্যাভিনিউ
এইট্‌থ অ্যাভিনিউ
বেড়ে-ওঠা তীব্র-হওয়া   কানেতালালাগানো   গুঞ্জনে।

ট্রেন যখন চ'লে গেলো   দলছুট এক হাওয়া
এক খবরকাগজের পাতাগুলো   উড়িয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিলো
যাতে ছিলো এক প্রতিবেদন
অজ্ঞাত ঠিকানার, এক লোকের ভাগ্যের,   ছিলো তার পরিচয়,
যার পরনে ছাইরঙা ওভারকোট   আর বাদামি টুপি,
যে বিষণ্ণ আর অবসন্ন।

দেবায়তন

সর্বত্রই ভগবান বিরাজমান।
আমার মনে হয়
                ঢ্যাঙা অশ্বিসার
                সর্বশোষক শুণ্ড,

দিকে-দিকে সজাগ চক্ষু, পল-কাটা,
ঘেমো দাগ

তিনি শুধু তাগ করেন, আর তাগ করেন, আর চুপচাপ থাকেন,
চুপচাপ থাকেন আর তাগ করেন,
অতএব আছেন।

কোনো জানলায়, রাস্তার কোনো মোড়ে,
গর্তে, নর্দমায়,
মেঘে, আমাদের
জীবদ্দশায় তথাস্তু।

প্রসঙ্গত, আমরা যে এখানে আছি
সে তো কেবল এই কারণেই
যে কেউই
চাঁদমারিতে লাগাতে পারেনি এখনও।

ব্রুকলিন গোরস্থান

মৃতদের চিৎপটাং ফ্ল্যাটবাড়ি।
মাটির তলার শোবার ঘরগুলো থেকে
ফিনকি দিয়ে বেরোয় ছোটো-ছোটো সব উষ্ণ প্রস্রবণ
সোৎসাহ সব বিদেশী কণ্ঠের।

শেষ প্রশ্নগুলোর
জরুরি আর উত্তেজিত হট্টগোল :
ক-টা পা থাকে ডিমের ?
আর সবুজ রঙের কুকুরেরা—তারা কি হাওয়ার চেয়েও হালকা ?
তোমার প্লীহায় কি আগুন ধ'রে যায় ?
একবার ফ্লাশ টানলেই কি কর্কটরোগ সাফ হ'য়ে যায় ?
সেণ্ট এলিজাবেথের পোঁদ কী-রকম ছিলো ?
কখনো চোখে দেখেছো বৃক্কের পাথর ?
তোমারও ঢু-ঠ্যাঙের ফাঁকে কোনো প্রশ্নচিহ্ন গজাচ্ছে না কি ?

তলা থেকে
হাজারটা পরদরদী হাত
তালা আটকে দিতে চেষ্টা করছে,

কিন্তু মাটি কিছুতেই বন্ধ থাকবে না।

প'ড়ে-পাওয়া-কবিতা

শিরোনাম

প্রেসিডেন্ট আর মিসেস জনসন
সঙ্গে ছিলেন তাঁদের বড়ো মেয়ে লিনডা
আজ ন্যাশনাল সিটি ক্রিশ্চিযান চার্চে প্রার্থনা করেছেন
মানবিক অধিকার
আব বর্ণসৌষম্য বজায় রাখার জন্য।
মিস জনসনের পোশাক ছিলো,
শাদা
    আর চকোলেট-খয়েরি,
ভারি সুতি কাপড়ের,
আমেরিকায নির্মিত।

নিউ-ইয়র্ক টাইমস, ৩১ জুলাই ১৯৬৭

মধ্যপ্রাচ্যবিতর্ক, নিউ-ইয়র্ক

পুলিশ
৪৭ স্ট্রিটের দক্ষিণ প্রান্তকে
সোভিয়েৎ-বিরোধী
আর উত্তর প্রান্তকে
সোভিয়েৎ-পক্ষীয় পিকেটের জন্য
নির্দিষ্ট ক'রে দিয়েছে।

তবে
পুলিশ ঠিকঠাক বুঝে উঠতে পারেনি
স্যালেম, ম্যাসাচুসেট্‌সের
ইয়োজেফ মিওট-ম্রুজ়কে নিয়ে কী করবে,
যে দাঁড়িয়েছিলো ফার্স্ট অ্যাভিনিউতে
বৃষ্টির মধ্যে
তার বাম গলবন্ধে লাগানো ছিলো
বেলোয়ারি এক মার্কিন নিশান।
তার হাতে ছিলো এক পোস্টার, তাতে লেখা :

য়িহুদিরা সব খুনে।
সাম্যবাদ য়িহুদি।
আপাদমস্তক।
সাম্যবাদ ঠেকান।
পোলাণ্ডের স্বাধীনতা-সংগ্রামী, সমিতিবদ্ধ।

পুলিশের এক কাপ্তান
ফ্রান্সিস আর. কেলি
প্রথমে পান্ মিওট-ম্রুজ়কে
নিয়ে গিয়েছিলো দক্ষিণদিকে।
একটুক্ষণ কথা বলার পর
কাপ্তান কেলি মাথা নাড়তে-নাড়তে
চ'লে যায়, সে বিড়বিড় ক'রে বলছিলো :

কোথায় যে লোকটাকে রাখবো
সে কিছুতেই আমার মাথায় আসছে না।

নিউ-ইয়র্ক টাইমস, জুন ১৯৬৭

রাক্ষসতত্ত্ব

বাগানের রাস্তায় দৈত্যদের পূর্ণোদর ছোঁ,
শাদা থালার মতো চোখ,
গোড়ালিতে শক্ত-আঁটা ক্রুশের রক্তরাঙা দাগ
এখান থেকে অসীম পর্যন্ত।

আগুনের ডুকরে-ওঠা মায়ানেকড়ে
ঢুকে পড়ে শহরগুলোয়
গ'ড়ে উঠতে-না-উঠতেই।

সাফল্যের পিঠচাপড়ানো আহ্লাদ
পৃথুলা মেদিনীর গায়ে
রবারের স্প্রিঙে লাফঝাঁপায়,
নিওন আলোয় দোল খায়,
ছাতে দুপদাপ হাঁটে।

আর দুর্ভাগ্যের বাঁশি-মার্কা উড়োভূত,
সুতোবাঁধা, আমাদের পেছনে হিঁচড়োয়।

সবখানেই বিস্তর আছে এ-বস্তু,
চকমেলানো ঝকঝকে সিনেমাগুলোর ঝলশানিতে,
ভ্যান থেকে গড়িয়ে-পড়া বোতল-ভরা বাক্সের ঝনঝনানিতে।
বুদ্ধিতে-যার-ব্যাখ্যা-চলে-না ছোটোখাটো এমন অলৌকিক-কাণ্ড-ঘটাবার
অনুজ্ঞালিপি নেবার এটাই প্রকৃষ্ট সময়।

আর আমাদের প্রত্যেকেরই বাড়িতে আছে
যাকে বলা যায়
ছোটো একরকম বাক্স,
দেরাজের মতো বড়ো কখনো
কিংবা মরা ইঁদুরের চোখের মতো
চুপশে-যাওয়া,

ভেতরে কী যেন নখ আঁচড়ায়,
কিংবা পেকে ওঠে পরিশ্রমে,
কিংবা চুপচাপ বানাতে থাকে কিছু,

কিন্তু খুলতে আমাদের সাহস হয় না
কারণ অনেকবারই
ভেতরে কিছুই ছিলো না।

দুই

আরো-একবার এই অধঃপতন
পা ওপরে মুণ্ডু তলায়
কোনো-একটা আছাড়খাওয়া মহাকাশযান থেকে
তুহিন শূন্যতার মধ্য দিয়ে,
শরীর থেকে জামাকাপড় হ্যাঁচকা টানে ছিঁড়ে খোলে যেন
আর কানেতালাধরানো পৃথিবী এগিয়ে আসে
কোনো ক্ষিপ্ত প্রচণ্ড ধর্মান্ধ নতুন আচারবিধির মতো,
স্কিৎসোফ্রেনিয়ায়-ভোগা কোনো কামানের গোলার মতো।

আর হঠাৎ—মাটিতে নেমে প'ড়ে
আর হঠাৎই—দুই টুকরো হ'য়ে গিয়ে—
আর হঠাৎই ডুবে গিয়ে
একজনের মধ্যে আরেকজন
আমরা তো
পৃথিবীর গায়েই পৃথিবীর ছাপ
আর আমাদের মধ্য থেকে তোড়ে বেরিয়ে আসে কালো ন্যাপথা
কোনো দৈবাৎ-পাওয়া ফ্ল্যাটবাড়ির নদীর খাত দিয়ে
আর চুঁইয়ে ঢুকে পড়ে
দরজার পাল্লায় চেপটে-যাওয়া
প্রতিহিংসাপরায়ণ দেবদূতদের মধ্যে।
আর তারপর রাত্রি ছাড়া আর-কিছুই নেই

আমাদের জন্য
আর তারপর উষা ছাড়া আর-কিছুই নেই
আমাদের জন্য
আর শুধু মহাকাশচারীদের শুষ্ক ধূসর নিঃসঙ্গ মহিমা
যারা তাদের ডানা হারিয়েছে
কোনো অচেনা বিদেশ-বিভুঁইয়ে।

কংক্রিট

আগ্নেয়শিলায় তৈরি এক ধূসর নক্ষত্র :
কংক্রিটের দেয়াল,   কংক্রিটের মাটি,
কংক্রিটের আকাশ,   কংক্রিটের গাছপালা,
কংক্রিটের দোলনা, হুল্লোড়,   . কংক্রিটের মায়ামমতা।

কয়েকটা খড়বাঁশের পুতুল
তাদের নাটকটা অভিনয় করে।   পাঞ্চের ভূমিকায় ড্র্যাগন,
আর ড্র্যাগনের, পাঞ্চ।   গোল্লায়-যেতে-থাকা
দেবদূতদের সে কী কোলাহল!

কংক্রিটের তোরণগুলোয়   আলখাল্লাপরা কনস্থলরা
বর্বরদের প্রতীক্ষা করে।   কিন্তু
আর তো কোনো বর্বর নেই কোথাও।
শুধু কেবল পাথরের কোমেন্দাতোরে তুলে ধরে
আমাদের চামড়ার সমাধিশিলা
আর ডুকরে ওঠে   বদ্ধনিশ্চল অন্ধকারে।

কংক্রিটের দেয়াল।   কংক্রিটের চিন্তাভাবনা।
কংক্রিটের রেতঃপাত।   কংক্রিটের কেশপাশ।
আর যখন আমরা ছুঁই,   বালি ঝ'রে পড়ে মিহি ধারায়।
আরো-ভালো কংক্রিটের
প্রয়োজন।
এতদিনে যথেষ্ট রক্তপাত হয়েছে।

ভাঁড়েরা

দিলো লাফঝাঁপ। দাপাদাপি করলো মাটিতে।
কুঁচকে গুটিয়ে মিইয়ে গেলো। হামাগুড়ি দিয়ে গিয়ে ঢুকলো চোখের মণিতে।
ফুলে ফেঁপে উঠলো। লেপটে রইলো
এক নির্দেশসূচক বাগ্‌বিধিতে।

তারা গর্‌র্‌র্ ঘেউ-ঘেউ ক'রে উঠলো। তারা গান ধরলো।
প্রতিষ্ঠা করলো এক নীলমাছির সার্কাস,
আর হামাগুড়ি দিয়ে গিয়ে ঢুকলো তার মধ্যে।

তারা কুসুমিত হ'য়ে উঠলো। শুকিয়ে ঝ'রে পড়লো।
কুমড়োয় চেপে উড়লো, নামলো একটা চুল বেয়ে।
এইভাবেই
পৌঁছুলো সবকিছুর মূলে, শিকড়ে।

ঘণ্টা বাজালো। আলো নিভিয়ে দিলো।
হাততালি দিয়ে যখন আবার কুর্নিশ করতে ডাকা হ'লো, তাদের পাত্তা মেলেনি।
হুমহাম খেলো টুপি, ঘণ্টা।
পরিণামে
তাদের নিয়োগ করা হ'লো

ভাঁড়েদের তত্ত্বাবধায়ক।

এক মৃত ভাষার পাঠ্যপুস্তক

ইহা একটি বালক।
ইহা একটি বালিকা।

বালকটির একটি কুকুর আছে।
বালিকাটির একটি বিড়াল আছে।

কুকুরটির গায়ের রঙ কী ?
বিড়ালটির গায়ের রঙ কী ?

বালক-বালিকা
একটি বল লইয়া খেলা করিতেছে।

বলটি কোন্‌খানে গড়াইয়া যাইতেছে ?
বালকটিকে কোথায় সমাধিস্থ করা হইল ?
বালিকাটিকে কোথায় সমাধিস্থ করা হইল ?

পড়ো
আর অনুবাদ করো
সব স্তব্ধতায় আর সব ভাষায় !

লেখো
তোমরা নিজেরা কোথায়
সমাধিস্থ আছো।

পাঠ

একটা গাছ ঢুকে পড়ে আর নুয়ে অভিবাদন ক'রে বলে :
আমি গাছ।
আকাশ থেকে ঝ'রে পড়ে কালো অশ্রুর ফোঁটা আর বলে :
আমি পাখি।

মাকড়শার জাল থেকে নামে
প্রেমের মতো কিছু-একটা
কাছে আসে
আর বলে :
আমি স্তব্ধতা।

কিন্তু ব্ল্যাকবোর্ডের পাশে ঘাড় ঝাঁকায়
ওয়েস্টকোট গায়ে
এক জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক
ঘোড়া, আর
বারে-বারে বলে,
সবদিকে তার কান খাড়া ক'রে
বলে আর বলে :
আমি ইতিহাসের ইনজিন
আর
আমরা সবাই
ভালোবাসি
প্রগতি
আর
সাহস
আর যোদ্ধার রোষ।

ক্লাসঘরের ভেজানো দরজার তলা দিয়ে
গড়িয়ে যায়
রক্তের এক সরু রেখা।

কারণ এখানেই শুরু
অপাপবিদ্ধের
নির্বিচার হত্যা।

আবিষ্কার

লম্বা শাদা টোগা-পরা জ্ঞানীগুণীরা এগিয়ে এলেন উৎসবের সময়, তাঁদের পরিশ্রমের প্রতিবেদন দিতে, আর রাজা বেলোস মন দিয়ে শোনেন।

হে, পরমভট্টারক, বললেন প্রথম জন, আমি আপনার সিংহাসনের জন্য এক-জোড়া পাখা বানিয়েছি। আপনি শূন্য থেকে দেশ শাসন করবেন।— অমনি

করতালি ও হর্ষধ্বনির ধুম প'ড়ে গেলো, বিপুল পারিতোষিক ঘোষণা করা হ'লো তাঁর জন্য।

হে, পরমভট্টারক, বললেন দ্বিতীয়, আমি একটি স্বয়ংক্রিয় ড্র্যাগন তৈরি করেছি, যে কিছু বলার আগেই নিজে থেকেই আপনার শত্রুদের পরাস্ত করবে।—অমনি করতালি ও হর্ষধ্বনির ধুম প'ড়ে গেলো, বিপুল পারিতোষিক ঘোষণা করা হ'লো তাঁর জন্য।

হে, পরমভট্টারক, বললেন তৃতীয়, আমি তৈরি করেছি এক দুঃস্বপ্নঘাতক। আপনার রাজকীয় সুষুপ্তিকে আর-কিছুই এখন ত্যক্ত করতে পারবে না।—অমনি করতালি ও হর্ষধ্বনির ধুম প'ড়ে গেলো, বিপুল পারিতোষিক ঘোষণা করা হ'লো তাঁর জন্য।

কিন্তু চতুর্থজন শুধু বললেন : এ-বছর ব্যর্থতা আমাকে অনবরত কুকুরের মতো তাড়া ক'রে ফিরেছে। কিছুই ঠিকমতো হয়নি। যাতেই হাত দিয়েছি, তা-ই ব্যর্থ হয়েছে।—সন্ত্রস্ত স্তব্ধতা নেমে এলো আর রাজা বেলোস্‌ও স্তব্ধ থেকে গেলেন।

পরে এ-তথ্যটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো যে চতুর্থজন আর্কিমিডিস।

পোলোনিয়াস

সব চিকের আড়ালে
সে তার কর্তব্য করে
অবিচল।

দেয়াল তার কান,
চাবিফোকর তার চোখ।

গুঁড়ি মেরে ওঠে সিঁড়ি বেয়ে,
চুঁইয়ে পড়ে কড়িকাঠ থেকে,
দরজা দিয়ে ভেসে ঢোকে
সাক্ষী দিতে তৈরি,
যা প্রমাণিত তাকেই প্রমাণ করতে,
ছুঁচ বসিয়ে মারতে,
কিংবা কোনো হুকুমনামায় পিন আটকে দিতে।

তার কবিতা সবসময় মিল দেয়া,
তার তুলি মধুতে চোবানো,
তার গান
হয় মারজিপান নয় আখের মতো।

ওজনদরে কেনো ওকে
তোমরা, হাড়গোড় নেই, সবটাই মাংস,
আধকিলো মোমের মতো শরীর,
আধকিলো ইঁদুরমার্কা দর্শন,
আধকিলো ধামাধরা
মোরব্বা।

যখন বাজার ফাঁক ক'রে সে বিক্রি হ'য়ে যায়
টুকরো-টাকরা অবশিষ্ট থাকে এক
ফিতেঝোলা শোকসংবাদে মোড়ক-করা,
এক সবতাতে-ভয়-পাওয়া অন্ত্যেষ্টিপত্রে মোড়ক-বাঁধা

আর যখন স্মৃতির
ছ্যাদাজাগানো ছাঁচ ওকে
আগাপাশতলা ঢেকে দেয়,
যখন সে থুবড়ে পড়ে,
তারার দিকে পোঁদ ক'রে,

আস্ত মহাদেশ অনেক হালকা হবে,
অবশেষে সোজা হ'য়ে দাঁড়াবে পৃথিবীর অক্ষ
আর রাতের বাজফাটানো চত্বরে
খুশি গলায় গান ধরবে পাখি কৃতজ্ঞতায়।

'সামান্য উষ্ণতাওলা উত্তাপ'

তারা নেয়
জগতের একটা টুকরো,
চাপায়
ডেকচিতে,
ভাপে সেদ্ধ করে
তার নিজের রসে,
শোনে
ডেকচির ভিতরকার তপ্ত শোঁ-শোঁ আওয়াজ।

সারা জীবন
তারা অপেক্ষা করে
মাংসের বড়া ভাজার জন্য।

কিন্তু ঢাকনির তলায়
আছে শুধু
কিছু সমীকরণ,
তুষারহিম
আর শিখাময়।

আর্কিমিডিসকে খুন করেছিলো যে-করপোর‍্যাল

এক দৃপ্ত আঘাতে
সে খুন করেছিলো বৃত্ত, স্পর্শক
আর চিরন্তনতায় প্রতিচ্ছেদবিন্দু।

ঝুঁকে-ব'সে-থাকার
শাস্তি হিশেবে
সে তিনের পর থেকে সমস্ত সংখ্যা
নিষিদ্ধ ক'রে দিলো।

এখন সে সাইরাকুজে
এক দর্শনচর্চাকেন্দ্রের বিভাগীয় প্রধান,
আরেক হাজার বছরের জন্য
তার কুঠারের উপর উবু হ'য়ে ব'সে আছে
আর লিখছে :

এক দুই
এক দুই
এক দুই
এক দুই

নেপোলিয়ান

আচ্ছা, বলো তো, কবে
নেপোলিয়ান বোনাপার্ট জন্মেছিলেন,
জিগেশ করলেন ক্লাশের দিদিমণি।

হাজার বছর আগে, বললে ছেলেমেয়েরা।
একশো বছর আগে, বললে ছেলেমেয়েরা।

গত বছর, বললে ছেলেমেয়েরা।
সঠিক কেউই জানে না।

আচ্ছা, বলো দেখি, এই
নেপোলিয়ান বোনাপার্ট কী করেছিলেন,
জিগেশ করলেন দিদিমণি।

এক যুদ্ধে জিতেছিলেন, বললে ছেলেমেয়েরা।
এক যুদ্ধে হেরেছিলেন, বললে ছেলেমেয়েরা।
সঠিক কেউই জানে না।

আমাদের মাংসওলার এক কুকুর ছিলো,
নাম নেপোলিয়ান,
বললে ফ্রান্‌তিসেক।
মাংসওলা ওকে বেধড়ক বেদম পেটাতো, আর কুকুরটা মরলো
না-খেতে পেয়ে,
একবছর আগে।

আর ছেলেমেয়েরা সবাই ভারি কষ্ট পেলে এখন
নেপোলিয়ানের জন্য।

নৈশভোজ

একেবারে শেষ চামচেটুকু অবধি ঐ স্যুপ খেতে হবে তোমায়
কারণ স্বাদ পুষ্টি সবকিছু-ভালো ওতেই আছে।
খেয়ে নাও, কী চমৎকার স্যুপ, নাও, খাও—খেলা কোরো না ও নিয়ে,
ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফেলো না।
না-খেলে রোগা মিরকুট্টে থাকবে সারাজীবন, আর কোনোদিনই
বড়ো হ'তে পারবে না!

নিজের দোষেই পারবে না।
ছাখোনি, যে-সব শহর আর দেশ ছোটো থেকে গেছে
সে তো তাদের নিজের দোষেই।
ছোটো দেশগুলোরই আমি দোষ দিই—কেন তারা শক্তিশালী হ'তে
পারলো না। যাক-গে, এখন তো টের পাচ্ছে!
ইথ্ বেশুস্‌ডিগে ডি ক্লাইনেন নাটিওনেন…
আক্কুসো লে পিক্কোলে নাতিওনি…
জ্যাকুস্ লে পেতিৎ নাসিয়ঁ…
বাড়াবাড়ি কোরো না, নাও, চট ক'রে খেয়ে নাও সূপটুকু, গরম-গরম,
ঠাণ্ডা হিম হ'য়ে যাবার আগেই।

প্রাহা, জানুয়ারি

আর এখানে পা দাপাচ্ছে পিকাসোর ষাঁড়।
আর এখানে মাকড়শার পায়ে কুচকাওয়াজ করছে দালির হাতি।
আর এখানে শোয়েনবার্গের ঢাক বাজছে।
আর এখানে ঘোড়ায় চ'ড়ে ছুটছেন লা মাঞ্চার ভদ্রলোক।
আর এখানে হ্যামলেটকে ব'য়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে কারামাজোভরা।
আর এখানে পরমাণুরাই সারাৎসার।
আর এখানে আছে চান্দ্র-অভিযানের বন্দর।
আর এখানে এক পাষাণমূর্তি দাঁড়িয়েছে—মশালহীন।
আর এখানে মশাল ছুটছে পাষাণমূর্তি ছাড়াই।
আর এ তো সহজ ব্যাপার। যেখানে মানুষ
শেষ হয়, সেখানেই শিখা জ্ব'লে ওঠে।
আর তারপর স্তব্ধতায় তুমি শুনতে পাবে ভস্মকীটের
দাঁতকপাটি। কারণ
শতকোটি মানুষ প্রধানত
তাদের মুখ বুঁজে আছে।

সি | ন | ডে | রে | ল্লা

মাকড়শার মতো কিছু-একটার উড়াল

তুফানের মধ্যে জঞ্জালের মতো সে চঞ্চল ছুটোছুটি করছিলো
অথচ হাওয়া কিন্তু ছিলো না মোটেই, শুধু ছিলো
ভেতরকার স্নায়ুগুলোর আলোড়ন,
সে ছুটোছুটি করে, চঞ্চল, অস্থির, শেয়াল-লাল,
যেন কোনো বিভীষিকার কাঁটা-ওঠা স্ফটিক,
একেকটা পা তার নিজের ভয়ের মধ্যেটায়,
একটার পর আরেকটা
আর সব একসঙ্গে মিলে
ছত্রভঙ্গ ঠেলাঠেলি
পায়ের
আর মাথার
আর দাঁতের
আর স্তনঝোলা জঠরের
আর চুলের
আর স্তনের বোঁটার
আর যৌনাঙ্গের,
ছুটোছুটি করছিলো কোনো ভাবনার মতো ন্যায়বিচারের উদ্দেশে
ধন্য, ধন্য, ধন্য
সদাপ্রভু
একটা পথহারা ক্ষেপণাস্ত্র
যেটা তারা ছুঁড়েছিলো ট্রিয়াসিক যুগের শেষে
আর এখনও যেটা চলেছে তার নিজের কক্ষপথে
কংক্রিটের ওপর দিয়ে (লেখা আছে : প্রস্থানপথ।
প্রবেশপথ।
দাঁড়াবার জায়গা।
ক···খ···গ···)

অ্যাস্‌ফল্টের ওপর দিয়ে (টায়ারের নমুনা ·
জুতোর মাপ ৪২,
পেট্রলের রামধনু ;
নীল বালি)
কানফাটানো সংগীতের তৃষিত দেয়ালের ওপর দিয়ে
(আমি তাকে ভালোবাসি
আমি তাকে ভালোবাসি
সে যেখানে যাবে, জেনো
আমি যাবো পিছে তারই
আমি যাবো পিছে-পিছে
আমি যাবো পি-ছে পি-ছে)

স্বর্গরাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত

প্রতিটি চোখ ভ'রে আছে কোনো জুতোর শুখতলির
পলকাটা দৃষ্টিপাতে,
নির্ঘাৎ যে শিগগিরই মাড়িয়ে যাবে
কোনোকিছু,
প্রতিটি চোখ ভ'রে আছে কোনো ফাটলের দৃষ্টিপাতে
এক ঝিলিক অথচ অগ্নি দেখায় যে ফাটল নেই আর
কখনও থাকবেও না কোথাও,
প্রভু আমাদের দাও এই দিন দৈনন্দিন রুটি
এবং কদাপি আমাদের চালিত করিও না
ছুটোছুটি করে, চঞ্চল, অস্থির, অন্ধের
প্রায়-শোনা-যায়-না বিলাপের মতো, সেই স্পর্শাতীত
কম্পন যা আসে
আঘাতটা ঝপ ক'রে পড়বার ঠিক আগটায়,
আবেগ আর তাড়নার এক অদ্ভুত ফশকাগেরো
যেটা জ্বালিয়ে দেয় একে-আরকে
কোনো শিখার বৃত্তে
আর নিঃসৃত আন্দোলন তো শুকিয়ে-যাওয়াই,
যবে মোরা ক্ষমা করি

হারিয়ে বসে একটা পা
নয়তো কোনো শুঁড়
যেটা কিছুক্ষণের জন্য
নিজেই ছুট লাগায়
তার জান্তবতা আর
কোমলতার অংশটা পেয়ে গিয়ে
ইহাই আমার রুধির
এবং আমার দেহ যাহা
উৎসৃষ্ট হইয়াছিল তোমাদেরই জন্য
মস্তিষ্কের স্নায়ুকেন্দ্রের এক
ভয়াবহ যুক্তিতে ছুটোছুটি করে, চঞ্চল, অস্থির, ত্রস্ত,
প্রাক্‌- ও পশ্চাৎ- গলবিলঘটিত স্নায়ুকোষ
পিছনে প'ড়ে থাকে তার ডিমগুলো, যারা ম'রে যায়
এক-এক ক'রে, প'ড়ে থাকে তার শুক্রাণু,
যা ফেটে পড়ে ক্ষীণ এক ঢাকের শব্দে,
সার বেঁধে প'ড়ে থাকে তার লসিকা
একটা অম্লায়ত হ'তে-না-হ'তেই আরেকটা,
আর তার শ্বাসনালী দম ছাড়ে
জেরিকোর তূরীভেরীর মতো,
তার অস্তিত্বের ফুটো-হওয়া কপাটিক,
পরমপিতা, পুত্র এবং
দিব্য আত্মার নামে
তথাস্তু
ছুটোছুটি করে জঞ্জালের মতো তুফানে, অস্থির, ত্রস্ত—
আর সেখানে কোনো হাওয়া নেই,
মঙ্গলবার, সেপ্টেম্বরের চোদ্দ তারিখ,
সন্ত রাদোমিরের নামের বার,
বিকেলবেলা, ভেষজ ঘৃতের এক সূর্য,
(আমি তাকে ভালোবাসি
আমি তাকে ভালোবাসি
সে যেখানে যাবে, জেনো

আমি যাবো পিছে তারই
আমি যাবো পিছে-পিছে
আমি যাবো পি-ছে পি-ছে)

আমরা হেঁটে চলি,
আমি যেন কোলের কুকুর এক, এমন ভাব করো তুমি আমার সঙ্গে
তুমি বলো,
আর তা শোনায় যেন
এক অতি-অতি পুরোনো গল্পের মতো
এলিসীয় প্রান্তরের দিব্যধামের
অধঃস্তর থেকে উঠে-আসা।

স্তব্ধতার শারীরসংস্থান

হাতের নাগালের মধ্যেই আছে
এক কাচের দেয়াল
দুইশতকোটি আটশো লক্ষ
ফসিল মাকড়শাদের বোনা।
কাচের মধ্যে এখানে-ওখানে বসানো
এক কিনিয়াপিথেক মুখ
কোনো প্রাগৈতিহাসিক রাজকন্যার
কনুইয়ের হাড়
কোনো পোষা ড্র্যাগনের শিরোভূষণ।

শব্দ, তাহার ভিতরে শব্দ···

এক পিয়ানো তুফান তুলছে
দিগন্ত থেকে দিগন্তে,
রামধনুচাবিওলা এক পিয়ানো,
পাতালের এক রোমশ রাক্ষসের
সাত-আঙুলের থাবায় আঁচড়ানো
এক বিদ্যুৎচল পিয়ানো।

শব্দের ভিতরে শব্দ, পারে না সে
উচ্চারিতে শব্দ কোনো···

আর অন্য-একটা হাত সাগ্রহে বাড়িয়ে দেয়া, মিথ্যেই।
অবাক কাণ্ড, এ যে নিজেরই হাত। সে মিলিয়ে যায়
এলোমেলো মেঘে আর
আড়াল থেকে উদয় হয়,
চুঁইয়ে পড়ে ছত্রাকবৎ
রক্তকণিকায়,
হাড়ের বুড়ো জোড়গুলোকে ক্ষিপ্ত হ'য়ে চিপটে দিয়ে।

শব্দের ভিতরে শব্দ, পারে না সে
উচ্চারিতে শব্দ কোনো,
তমিস্রায় আষ্টেপৃষ্ঠে ঘেরা

কিন্তু বাস্তব তো বক্ররেখ
আর নাটকের দেয়ালগুলো গুটিয়ে যায়
কোনো পিঁপড়ে-সিংহের চোঙে,
এক ঘূর্ণি চক্কর খেয়ে বেরিয়ে আসে ডিমের মধ্য থেকে সাপের মতো,
চুষে নেয় কাচ-কাচ ভাব আর
পেশীর সব দড়ি আর
নগরীগুলোর বুড়ির-পাকাচুল
আর ম্যাকবেথের সব ভাবনা
আর জুলিয়েটের সব স্বপ্ন
পাক খায় মাথা-ঘোরানো
দ্রুত থেকে দ্রুততর
ভুখেল
চোঙটার মধ্যে
যেখানে এক
অ্যানেনসেফালিক
মাটির পায়রা
ব'সে থাকে
আর ঝোলে তোমার ঠোঁট থেকে

শব্দের ভিতরে শব্দ
তমিস্রায় আষ্টেপৃষ্ঠে ঘেরা

শিরোনামবিহীন

অবশ্যই আমরা কাঁটাঝোপে শুয়ে বই পড়তে পারি
আর স্বাদ পেতে পারি মার্সেল প্রুস্তের।
অবশ্যই আমরা প্রতিরক্ষিকা বানাতে পারি
তিনগুণ, ইন্টি বিন্টি সিন্টি খেলতে-খেলতেই।
অবশ্যই আমরা ক্ষতিপূরণ দিতে পারি সাইথিয়ার লোকদের।

অবশ্যই আমরা ধ্রুবতারাকে ভাবতে পারি
ফশকা-শেলাইয়ের একটা বিশেষ নজির।
অবশ্যই আমরা ভ্যানিলা আর সুপারফসফেটে ভরপুর
একটা শস্কুল বাক্সে ঠাকুর্দাকে ব'য়ে নিয়ে যেতে পারি হাটে।
অবশ্যই আমরা লুক্সেমবুর্গের জনের বিনিময়ে
পেয়ে যেতে পারি গোটা দুই ডাংগুলির ডাণ্ডা।
অবশ্যই আমরা গিলে ফেলতে পারি করোটির যৌনজীবনের যাবতীয় কথা
যা-সব বলে পুরুষাঙ্গখেচকেরা।

অবশ্যই আমরা নতুন চাঁদের তলায় ঘেউ-ঘেউ অথবা
সংগম করতে পারি।
অবশ্যই আমরা পাতাগোনিয়ায় গাঁজিয়ে তুলতে পারি দুধ।
অবশ্যই আমরা হলফ ক'রে বলতে পারি যে আমরা বেঁচে নেই
যে আমরা বেঁচে থাকবো না আর কখনো বাঁচিনি।

অবশ্যই আমরা কোনো ঘোড়া-বাদামের সবচেয়ে খুদে ছ্যাদাটা দিয়ে
গ'লে পড়তে পারি।

যদি-অন্তত কেউ, যদি সম্ভব হয় স্বয়ং সদাপ্রভু
অথবা তাঁরই কোনো দায়িত্বসম্পন্ন সহকারী,
আমাদের দয়া ক'রে ব'লে দেন
'অবশ্যই'
এবং
'পারা'
কথাদুটোর অর্থ।

গ্রহ

মডিউলটা বানানো হয়েছিলো যাতে হড়বড় ক'রে নামা যায়।
আর গ্রহটার ওপর — শুধু জ্ব'লে, নিভে-যাওয়া পাথর
আর অঙ্গার, জীবনের কোনো ফুলকিই নেই।

বিস্ফোরণ।

কিন্তু প্রথম পাহারারা সবাই খুন হ'য়ে গেছে।
দাঁতে-নখে ছিন্ন-ভিন্ন-হওয়া লাশগুলোকে
খামকাই কবর দেয়া হ'লো। কালো দিবালোকে
তারা তক্ষুনি উধাও হ'যে গেলো পাথরের কবরগুলো থেকে
আর পরের দিন আক্রমণ করলো জীবিতদের।

তারা অনুভব করেছিলো যে কোনো-একটা নীতি,
আত্মায় ভ্যামপায়ার, অপেক্ষা করছিলো এখানে
শরীর, মগজ আর ভাবনাগুলোকে কাজে লাগাবে ব'লে,
কী কাজে এবং কেন, সেটা অন্ধকার, চর্কিপাক আর হাসির মতো
ছিলো তলহীন।

আর অন্যরা গলাধঃকৃত হ'লো, আর অন্যরা
বীভৎসভাবে বিঁধিয়ে-মারা মড়াদের মধ্যে চড়াও হ'তে লাগলো
জীবিতদের ওপর।

শেষটায় এমন হ'লো যে বোঝাই দায়
কার মধ্যে তখনও ছিলো আদৎ প্রাণ।

গ্রহ দাঁড়িয়ে রইলো এমনভাবে, যেন একপাল নেকড়ের গর্‌গর্‌
পাথর হ'য়ে গেছে সময়হীনতায়।

কাঁকড়ার ভান ক'রে আর কোনো লাভ নেই।
তারা জানে, আর এও জানে তাদেরই মাধ্যমে।

তারা মেরামত ক'রে নিলে মডিউলটা আর বেরিয়ে
পড়লো পৃথিবীর উদ্দেশে।
হয়তো এখনো-মানুষ, হয়তো ভ্যামপায়ারও সেই সঙ্গে

আর এটা জানা নেই সত্যি তারা কোথাও গিয়ে নেমেছিলো কিনা
আর এটাও জানা নেই সত্যি কী এসে এখানে নেমেছিলো।
হ'তে পারে শুধু চিহ্নলক্ষণই আছে
কতগুলো। আর বিস্ফোরণের বাবুম বুবুম বুম।
আর মরা হাবাগোবাদের অদ্ভুত-সব ক্রিয়াকলাপ।

বুলফাইট

কেউ ছুটে বেড়াচ্ছে,
কেউ গন্ধ পাচ্ছে হাওয়ার,
কেউ পা আছড়াচ্ছে মাটিতে, কিন্তু এ ভারি কঠিন।

লাল নিশেনগুলো পৎপৎ করে
আর তার পুরোনো রংচং-করা পোশাক-পরা পিকাদোর
তার দুর্বল ভল্লে
জিতে নেয় প্রথম ক্ষত।

লাল রক্ত ফিনকি দিয়ে ছোটে কাঁধের হাড় থেকে।

বুক ফেটে যাবে এক্ষুনি,
আলজিভ সমেত বেরিয়ে এসেছে জিহ্বা।
ক্ষুরগুলো দাপায় তাদের নিজেদেরই ইচ্ছেয়।

বান্দোলেরোদের তিন-তিনটি জোড়া পেছনে।
আর এক মাতাদোর বার ক'রে আনছে তার তলোয়ার
রেলিঙের ওপর দিয়ে।

আর তারপর কেউ (রক্তে-মাখামাখি, রক্তে ভরা)
থেমে প'ড়ে চেঁচিয়ে ওঠে :
চলো, কেটে পড়ি,
চলো, কেটে পড়ি,
চলো, এ-সব ছেড়েছুঁড়ে আমরা চ'লে যাই নদী পেরিয়ে গাছপালার মধ্যে।
চলো, সব ছেড়েছুঁড়ে আমরা চ'লে যাই নদী পেরিয়ে গাছপালার মধ্যে,
চলো, পেছনে সব ফেলে রেখে ঐ লাল ন্যাকড়াগুলো,
চলো, আমরা চ'লে যাই অন্যকোনোখানে।

এই ভাবেই সে চেঁচিয়ে ওঠে,
অথবা
অথবা ফিশফিশ করে,
আর সীমান্তের বাধা গ'র্জে ওঠে আর
কেউ কিছু বুঝে উঠতে পারে না কারণ
সকলেই অনুভব করছে সেই একই জিনিশ,

লাল-কালো ঘোমটা প'ড়ে যাবে
আর হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হবে তাকে,
আর হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হবে তাকে,
আর হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হবে তাকে,

জগতের ধরনধারণ না-বুঝেই
জগতের ধরনধারণ বুঝে-ওঠবার আগেই
জগতের ধরনধারণ সে কিছু জানতে পারার আগেই।

আরিয়াদ্‌নে

আদতে সেখানে ছিলো শুধু এক সমভূমি,
মাটি বশ্যতা মেনে নেয়
বোধহীনভাবে

আর তারপর দিগন্তের ওপর দিয়ে
আসে আরিয়াদ্‌নে,
হেঁটে চ'লে আসে
তার সুতোর গুলি সমেত,
শুরু করে দেয় সুতো খুলতে
জটের পর জট
শুধু সুতো

আর সুতো
বেরিয়ে পড়ে ভ্রমণে··· তাকে ঘিরে
শূন্য বনভূমির মধ্য থেকে
উঠে আসে এক দেয়াল, দেয়ালের পর দেয়াল,
উল্লম্ব আর আড়াআড়ি, দেয়াল আর প্রতিধ্বনি,
প্রতিধ্বনি, গুহা, গর্তের আশ্রয় আর উষ্ণ প্রস্রবণ,
সুতোটাকে ঘিরে গজিয়ে ওঠে এক গোলকধাঁধা
আর গিলে ফ্যালে সবকিছু, দিগন্ত আর আরিয়াদ্‌নেকে শুদ্ধ।

আর চাপা-পড়া পাহাড় বার ক'রে আনে এক ইঁদুর
আর ইঁদুর হ'য়ে ওঠে
মিনোটার।

চারপাশ থেকে শোনা যায় গর্জন। আর ভয়
ঘুরে-ঘুরে যায় ঢাকাবারান্দা দিয়ে কন্ধকাটা মুরগির মতো

আর তক্ষুনি আরিয়াদ্‌নে চট ক'রে
সুতো গুটিয়ে নিতে চেষ্টা করে, কিন্তু
বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই
তুমি তা পারো না।

দুর্গ

তোলো নিশেন,
গেঁথে ফ্যালো তাকে হাওয়ায়।
তুলে নাও এক দামি পাথর,
ঘাড়ের ওপর দিয়ে সেটা ছুঁড়ে মারো।

তারে ঘা মেরে-মেরে বাজাও।
ছুটে আসে এক কঁকুদ।
বাজাও টিউবা, ফুঁ দাও।
উঠে আসে এক দুর্গ।

তুমি বাজিয়ে চলো। যতক্ষণ-না তুমি ফেটে পড়ো।
কিন্তু চিড ধ'রে যায় দুর্গে, চারপাশে ছেৎরে পড়ে
আর ষাঁড ঝলশে যায়

আর তোমার
ঠোঁট দুটো শুকনো পোড়া আর আঙুলগুলো।
ছিটকে খুলে আসে। কোনো ম্যমির কালো ঠোঁট।
কোনো ইঁদুরের নখবেরোনো আঙুল।

আর সবকিছুই এখন
যখন মোড়ের কাছে
প্রথম অতিথিরা দেখা দেয়।

দৈববাণী

২৫ মার্চের খ্রিস্টান উৎসব

যখন আগুন জলছিলো মৃদু
বাইরে, জানলার নিচে,
এটা হ'তে পারতো রাত্তিরের একটা দলছুট হ্রেষা

এটা হ'তে পারতো জেরিকোর তূরীভেরী,
এ হ'তে পারতো তুষারের তলায়
কুঁজোদের এক ঐকতান,
এ হ'তে পারতো উইলোদের সঙ্গে কোনো ওকগাছের গল্পগুজব,
আর এ হ'তে পারতো কোনো প্যাঁচার ডানার তলায়
কোনো হরবোলা পাখির খুনশুটি।
এটা কোনো প্রধান দেবদূতের বিচারসভাও হ'তে পারতো
এবং এ হ'তে পারতো কোনো গোসাপের অলুক্ষুণে ভবিষ্যদ্বাণী।
এ হ'তে পারতো আমাদের একমাত্র ভালোবাসার বিলাপ।

কিন্তু টেবিলে ব'সেছিলেন যে-আধিকারিক, তিনি
আমাদের দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন :
শুনুন : আপনাদের শোনা উচিত।
আরো দৃঢ়চিত্তে শুনুন,
আসুন আমরা শুনি, শুনুন, তিনি শোনেন,
তাঁরা শোনেন, আরো দৃঢ়চিত্তে,
আরো দৃঢ়চিত্তে শুনুন,
শু নুন শু নুন,
শু নু ন,
শু নু ন আমাদের—

আর তাই আমরা সেই হতচ্ছাড়া একটা কথাও শুনতে পেলাম না

সিনডেরেল্লা

কড়াইশুঁটি বাছছে সিনডেরেল্লা :
ভালোগুলো, খারাপগুলো
এটা ভালো, ওটা খারাপ, এটা ভালো, ওটা খারাপ,
হ্যাঁ আর না, হ্যাঁ আর না।
আর সিনডেরেল্লা ঠকায় না। সিনডেরেল্লা ধোঁকা দেয় না।

কোনো-একখানে আছে হাস্যধ্বনি অনেক পরে।
তারা নিয়ে আসে ঘোড়াগুলো কারু জন্য
যে রাজার মতো ঘোড়ায় চ'ড়ে যাবে।

জুতোটা সত্যি তেমন ছোটো নয়,
শুধু পায়ের পাতাটা তোমাকে ছেঁটে ফেলতে হবে :
প্রকৃত সত্য এটাই এবং সকলের বেলাতেই এ প্রযোজ্য।

সিনডেরেল্লা কড়াইশুঁটি বাছছে :
ভালোগুলো, খারাপগুলো,
হ্যাঁ আর না, হ্যাঁ আর না।
এবং সিনডেরেল্লা ঠকায় না। সিনডেরেল্লা ধোঁকা দেয় না।

টুং-টাং ঘুন্টিলাগানো কোচবাক্স এসে গিয়েছে,
বলনাচের আসরে তারা সবাই মাথা নুইয়ে সম্ভাষণ করে
স্বয়ংনিয়োজিত বধূটিকে।

কোনো রক্ত গড়ায় না, কেবল লাল পাখিরা
এসে হাজির অনেক দূর থেকে,
পথে তাদের পালক গিয়েছে ছিঁড়ে।

সিনডেরেল্লা বেছে চলেছে কড়াইশুঁটি,
ভালোগুলো, খারাপগুলো,
হ্যাঁ আর না, হ্যাঁ আর না।

কোনো বাদাম নেই, কোনো রাজকুমার না,
কোনো পায়রা না, কোনো মাও নয়,
সেখানে আছে শুধু একটাই আশা :
সিনডেরেল্লা কড়াইশুঁটি বাছছে।

চুপচাপ, শান্ত, যেমনভাবে কেউ লাগিয়ে নেয় ছাতের কড়িবরগা,
যেমনভাবে জুড়ে দেয় ঘড়ির সূক্ষ্ম-সব কলকব্জা,
অথবা যেমনভাবে রুটি বেলে।

আর হয়তো তা হাওয়ার চেয়েও হালকা,
হয়তো মনের মধ্যে শুধু-একটা গান,
হয়তো একটা উড়ে-আসা পালক।

সিনডেরেল্লা কড়াইশুঁটি বাছছে :
ভালোগুলো, খারাপগুলো,
হ্যাঁ আর না, হ্যাঁ আর না।

সিনডেরেল্লা জানে। সে জানে গল্পটাকে,
জানে যে একদিন, কোনো জাঁকজমক ছাড়াই,
কড়াইশুঁটিগুলো বাছা হ'য়ে যাবে। যদিও···

কবিতা প্রকৌশলবিদ্যা

এ তো একটা ফিউজ,
তুমি যাকে লেলিয়ে দিয়েছিলে
কোথাও ঘাসের মধ্যে
অথবা কোনো গুহায়,
নয়তো লজ্ঝড়মার্কা
কোনো রেস্তোরাঁয়।

শিখা তীরের মতো ছুটে যায়
উদ্ভিদ আর
হতভম্ব প্রজাপতিদের পেরিয়ে,
পেরিয়ে যায় আঁৎকে-ওঠা পাথর
আর ঢুলতে-থাকা পানপাত্তর,

ছুটে যায় বিদ্যুৎবেগে
ছড়িয়ে পড়ে একটু
অথবা কুঁচকে আসে
কোনো উদ্বৃত্ত আঙুলের ব্যথার মতো,
হিস-হিস করে, ফোঁশ-ফোঁশ করে, চিড়বিড় ক'রে ফোটে,
থেমে যায়
কোনো আণুবীক্ষণিক ঘূর্ণিতে,

কিন্তু শেষটায়,
একেবারেই অবশেষে,
ফেটে পড়ে ধুমধড়াম,
যেন এক কামাননিনাদ,

শব্দের গুঁড়োগুলো
ভুমদাম ছিটকে যায় বিশ্বে,
দিনের দেয়ালগুলো গুমগুম করে

আর যদিও
পাথর মোটেই ফাটে না,
অন্তত কেউ-একজন ব'লে ওঠে—

শালা একটা কাণ্ড হ'লো বটে।

ডেডেলাস বিষয়ে

তার ঐ গোলকধাঁধায় এটা-ওটা নেড়ে-চেড়ে বেড়াচ্ছে ডেডেলাস
দেয়ালগুলো গুণের নামতার মতো বাড়তেই থাকে।
পালাবার কোনো রাস্তাই নেই।
কেবল পাখাগুলো।

কিন্তু চারপাশে — এ যে পালে-পালে ইকারুস ! হাওয়া একেবারে কালো
হ'য়ে আছে তাদের ভিড়ে।
শহরে-নগরে, মাঠে-ঘাটে, সমতল সব ভূমিতে।
হাওয়াই আড্ডার লবিতে / স্বয়ংক্রিয়
সব বিদায়সম্ভাষণ / ,
স্পেস কনট্রোল সেনটারে / অর্ধবিদ্যুৎপরিবাহীগুলোর
অতিবিষম মনোবৈকল্য / ;
খেলার মাঠগুলোয় / জোর-ক'রে-ধ'রে-আনা ছাত্রদের সব দল
১৯৬০-এর ক্লাসে পড়তো / ;
জাদুঘরগুলোর / সোনালি শ্মশ্রুগুলো
ফুলে ফেঁপে ওড়ে / ;
কড়িকাঠের ওপর / রামধনুর এক ঝিলিক-তোলা
কল্পনা / ,
জলাভূমিগুলোয় / রাতের বেলায় গাধার সুরে ডুকরোচ্ছে
১৬৪০-এর ক্লাস / ,
পাথরের মধ্যে / প্লাইস্টোসিন আঙুল,
উঁচিয়ে দেখাচ্ছে /

সময় ভ'রে আছে ইকারুসে-ইকারুসে।
বাতাস ভ'রে আছে ইকারুসে-ইকারুসে।
আত্মা ভ'রে আছে ইকারুসে-ইকারুসে।

দশকোটিলক্ষ ইকারুস—
তা থেকে শুধু একজন বাদ।

আর, হ্যাঁ, দ্যাখো, ডেডেলাস কি না এখনও
পাখাগুলোই
উদ্ভাবন করতে পারেনি।

মানুষের ভূ-বিদ্যা

কোনো-একরকম
স্বাভাবিক কাণ্ডজ্ঞান
আর-কি।

কোনো-একরকম
একেবারে প্রাথমিক
জীবনবোধ।

হৃৎপিণ্ড
কিংবা যকৃৎ
কিংবা হবে-আর-কি ঐ-রকমই কিছু-একটার
কোনো-একরকম
ভালোত্ব।

এ-সব গভীরতা সব বালির মধ্যে।

কেবল আসুক এক বদমেজাজি হাওয়া
এক ঢোঁক শ্নাপ্‌স্‌
কুসংস্কারের একটা ফোঁটা
ঠাকুমার কাছ থেকে

অমনি এসে হাজির প্লাবন।

ভালোত্ব
মনে হ'লো পাহাড়নির্মাণ।

প্রয়োজনীয়তার ওপর চাপানো
চৌম্বক স্তর না-থাকলে
কাণ্ডজ্ঞানের একটা খোলামকুচিও
দেখা দেবে না।

যার ধারগুলো জ'মে আড় ধ'রে যাচ্ছে
ব্যাসাল্ট আর গ্র্যানাইটে
সেই চিরন্তন রক্তস্রাব ছাড়া
আর-কিছুই নয়।

মানুষ হ'লো
দুই কোটি বছরের কীর্তি।

কাচের বোয়মের মধ্যে

পর্বত প্রসব করেছে এক মূষিক।
সেই জন্যে কোনো নামকরণ করা হয়নি, তবে ভবিষ্যতে
    কাজে লাগতে পারে ভেবে জীইয়ে রাখা হযেছে।
    তেমনি বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে
    দুশো নিষেধ,
না না, দুঃখিত, আমি ঠিক তা বোঝাইনি,
কয়েক আউন্স
শিক্ষক আর কোতোয়াল,

আর ছোট্ট সেই কাঠের তৈরি দোলঘোড়াটা।

তার গা থেকে খশিযে নেয়া হযেছে ট্র্যাজেডির আস্তর।
সে সব আরকের মধ্যে থেকে তাকায়, বলে,
পরের বছর আমি স্কুলে যাবো,
আর আমার পেটটা ভ'রে যাবে
অন্য-সব ছেলেপিলেয়।

আমরা শুনি, রক্তের এই নিশানা দেখে
লজ্জায় ম'রে যাই।

নবজাতক

কোনো দূর নীহারিকার সভ্যতার ঝলশানো চোখ নিয়ে
সে ঘ'টে যায়। বাতাসে আবর্জনার রাশি।

সে শুধোয়!
কী? গ্রন্থিস্রাবটার ব্যাপার কী? ফয়সালা হ'লো কোনো?
অথবা সৌরমণ্ডলের এই লাল বদনটার? ব্যাখ্যা হ'য়ে গেছে অ্যাদ্দিনে?
আমরা কি ক্যানসার শামলাতে পেরেছি?
কিংবা অ্যাসপিরিন খেলে-পরে কী প্রতিক্রিয়া হয়,
বার ক'রে ফেলেছি তার তত্ত্ব?
আর কণাতরঙ্গের সেই সমস্যাটা?
থার্মোডাইনাইমিকসের বিধিগুলো, চার নম্বরটা?
আর এখানকার আগাপাশতলা বজ্জাত বিশৃঙ্খলারই বা·খবর কী?

নবজাতক, স্পষ্টতই নিরাশ, আপনাতেই বিভোর হ'য়ে যায়।
ধীরে-ধীরে, রেশমসূক্ষ্ম চুলে ঢাকা প'ড়ে যায়, আর রাতে,
প্রায় অস্ফুটভাবেই,
সে ঘ্যানঘ্যান করে।

কিন্তু দলটা চ'লে যায় অন্যখানে।

বাড়িতে

যেন গত বছরের কোনো ঝুল থেকে বেরিয়ে
মা তার ক্যাঁচকেঁচ-করা দোলকেদারা থেকে তাকান:
'বাছা, তোকে ভালো দেখাচ্ছে।'

আর সত্যি জখমগুলো শুকিয়ে যাচ্ছে,
আমরা আবার বাচ্চা ছেলেমেয়ে হ'য়ে গেছি,
স্কুলটুলের কোনো বালাইই নেই।

আর যখন দিনকাল হ'য়ে পড়ে বেজায় বেয়াক্কেলে
আর সেখানে নেই যখন কোনো রাত্রি অথবা দিন,
কোনো উঁচু অথবা নিচু,
আর আমরা আমাদের দম হারিয়ে ফেলছি,

তিনি বলবেন
মাকড়শার ঐ ঝুলজাল থেকে,
'তোকে তো ভালোই দেখাচ্ছে, বাছা।'

আর জখমগুলো তাঁর চোখের সামনেই শুকোতে থাকবে
যদিও

তিনি অন্ধ, দৃষ্টিহীন।

কয়েকজন ভারি চালাক-চতুর লোক

তারা কথা বলতো পিন দিয়ে
তারা চুপ ক'রে থাকতো ছুঁচের মধ্যে।

রাত্রি ভর দিয়ে দাঁড়ালো
জগৎ নামক ছোট্ট ছেঁড়াখোঁড়া জন্তুটার গায়ে
তার হিমশীতল হাতে ভর দিয়ে

পরে, যখন তারা ঘরে ফিরে এলো,
তারা লাথি কষালে
রুটিকে

এ-কোণ থেকে
ও-কোণে।

গীতিকবিতার মেজাজ

ছোট্ট হাতি পিট দুলকি চালে চলে পোর্সেলেনের মধ্যে।
সুপরিসর সোয়ালো ঘুরছে বিদ্যুৎবাহী তারটার চারধারে।
আমরা কোনো গোলাপের মধ্যে তাকিয়ে দেখি তুঙ্গুজ উল্কার উড়াল
আর নক্ষত্রলোকের দিকে ধাবমান ঘুণপোকার পথ।

আমরা চ'লে যাই আস্ত একটা হাসিখুশি পুতুলদের লাইব্রেরি
আর আস্ত একটা মুখকরুণ পুতুলদের লাইব্রেরি পেরিয়ে।

কিশমিশের পর কিশমিশ তুলে-তুলে আমরা পরীক্ষা করেছি কেক
আর চোখের তারার পর চোখের তারা দেখে-দেখে
পরীক্ষা করেছি স্কুলের মেয়েদের চোখ।

দীর্ঘকাল আমি একাই হেঁটেছি :
গাছ, শিকড়, শিকড়, শিকড়-তন্তু, মাটি
পাথর, কাদামাটি, কাদামাটি, কাদামাটি, হাড়,
নিষিদ্ধ পথ,
মধ্যাহ্নভোজের আহ্বান।

ছায়ামূর্তি, বিভ্রম, দৃষ্টিভ্রম, ধোঁয়া আর বাষ্প,
বিদ্যুৎচমক, বাজ, কিছুই-না, কিছুই-না, ঘোষণা ক'রে দেয়
সরকারি হিশেব : কাল কত মাল তুলতে হবে।

বইয়ের তাকে বর্ণবিন্যাস,
আর্টগ্যালারিতে ইঁদুর।

আকাশে : যে-কোনো বেজম্মাকেই দেখায়
ডেভি ক্রকেটের মতো।
গভীরে : সব চিতই পিঠেতেই একটা ক'রে রাক্ষস।

আমি কিছুই পাইনি আজও,
কিন্তু এ-কথা তো আমি বলতে পারি।

যদিও…

শিক্ষক

পৃথিবী ঘুরছে,
বললে ছাত্র।
না, পৃথিবীটি ঘুরিতেছে,
বললেন শিক্ষক।

তোমার পাতারা মাঠের মধ্যে ঝ'রে পড়েছে,
বললে ছাত্র।
না, তোমার পাতারা মাঠের মধ্যে ঝরিয়া পড়িয়াছে,
বললেন শিক্ষক।

দুয়ে আর দুয়ে চার,
বললে ছাত্র।
দুই আর দুই মিলিয়া চার,
শিক্ষক তাকে শোধরান।

কেননা শিক্ষক বেশি ভালো জানেন।

সক্রেটিস

সন্দেহজনক লোক
তার নাক আবার থ্যাবড়া, ঘোড়ার জিনের মতো,
চোখ দুটি ব্যভিচারীর,
বদমায়েশটা তরুণদের মাথা খাচ্ছে,
সাম্প্রদায়িক দেবতাদের সে ঘৃণা করে,
নিজের অপ্রয়োজনীয়তায় সে বিপজ্জনক
এবং সে শুধু পান করেছিলো হেমলক।

তাকে ভিজে কম্বলে ঢেকে রাখা উচিত ছিলো।
বিশেষজ্ঞদের হাতে তুলে দিয়ে সজুত করানো উচিত ছিলো তাকে,

উপড়ে ফেলা উচিত ছিলো তার নখ
তার আপনত্ব আর তার জীবনের শেষ সমাপ্তি।

তার গায়ে সন্ধানী আলোর ছুরি বসানো উচিত ছিলো,
তার গায়ে বিজলি লেলিয়ে উচিত ছিলো দেখা তার মাত্রা
তার আপনত্ব আর আত্মা নিয়ে তার উৎকণ্ঠা।

ইলেকট্রিক চেয়ার পাওয়া উচিত ছিলো তার,
দেয়ালে দাঁড় করিয়ে দেয়া উচিত ছিলো তাকে,
তাকে আর তার আপনত্বকে আর তার ভালোত্বের ধারণাকে।

দৌড়ে যাবার সময় পেছন থেকে গুলি ক'রে মারা উচিত ছিলো তাকে,
তাকে আর তার আপনত্বকে আর তার চাঁদমারিকে।

সত্যি-বলতে
অনেকবারই
কোনো সক্রেটিস,
ভালো, মন্দ,
আস্থাজনক, অনাস্থাজনক,
গ্রহণযোগ্য, গ্রহণঅযোগ্য,
দরজার গায়ে বাদুড়ের মতো গেঁথে গিয়েছিলো

একমাত্র শুধু এই কারণেই যে পেরেকরা
প্লেটোর দ্বৈতালাপের চেয়ে
ঢের-ঢের বেশি ক'রে মেলে বাজারে।

গতকাল, আমার ধারণা
আমি দেখেছি সক্রেটিসকে, কথা বলছেন হাটের মধ্যে,
মুখে মৃদু হাসি।

গালিলেও গালিলেই

সাধুসন্তদের মরা মাছের চোখ চাটছে মাছিরা।

আমি, গালিলেও গালিলেই,
ফ্লরেন্সবাসী বয়স সত্তর,
ধর্মাবতারদের সামনে নতজানু…

যুগ মাড়িয়ে যাওয়া থেমে যায়।
দিব্য সুধা
গড়িয়ে পড়ে দেশকালের লোম বেয়ে,
বিশ্ব কুক্কুটী-মুণ্ড
উপড়োনো তারাদের দাঁত ভেঙে দেয় তার চঞ্চুতে,
হাল্লেলুইযা, হাল্লেলুইয়া…

আমি, গালিলেও গালিলেই,
দণ্ডাজ্ঞালাভের পূর্বমুহূর্তে,
ঈশ্বরের নামে শপথ…

পৃথিবী শিউরে ওঠে।
সূর্য তার শিকড় থেকে উপড়ে গিযে
চীৎকার ক'রে প'ড়ে যায়,
বিশ্ব কুঁচকে যায় হ্যালোযিনের মোমবাতির আলোয়
জ্যোতির্বিদরা অন্ধ হ'য়ে যায়…

আমি, গালিলেও গালিলেই,
শপথ করিতেছি
যে চিরকালই বিশ্বাস করিযাছি,
যে আমি এখন বিশ্বাস করি
এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহে চিরকাল বিশ্বাস করিব…

অণুবীক্ষণে চোখ লাগানো হা-ক্লান্ত লোকেরা
শুধোয়—এখন কী,

বাচ্চারা তাদের ডেস্ক থেকে উঠে পড়ে,
রক্ত ঝ'রে পড়ে বর্ণপরিচয়ের বই থেকে,
ইতিহাসবাহকেরা নামিয়ে রাখে তাদের কাঁধের ঝুঁড়ি,
অর্ধেক-সব পথ,
অর্ধেক-সব কর্ম
অর্ধেক-সব সত্য
হাড়ের মতো আটকে যায় গলায়···

দিব্য ক্যাথলিক, সন্তকথিত রোমক চার্চ
যাহাকিছু ঘোষণা করিয়াছে, স্বীকার
করিয়াছে এবং শিখাইয়াছে···

স্তব্ধতা।
পৃথিবী বানানো হয়েছিলো,
সূর্য বানানো হয়েছিলো,
স্বপ্ন হিম হ'য়ে যায় ধমনীতে।
সে, গালিলেও গালিলেই,
ফ্লরেন্সবাসী, সত্তর বছর বয়েস···

আমি, গালিলেও গালিলেই,
পাৎলা জামা গায়ে, মিনার্ভার মন্দিরে,
ব'য়ে নিয়ে বেড়াচ্ছি জগতের ভার
আমার রোগা মাকড়শা-পায়ে
আমি গালিলেও গালিলেই,

ফিশফিশ ক'রে বলছি
আমার দাড়ির ফাঁকে,
শুধু ছোটোদের জন্য, বাহকদের জন্য, সূর্য
ফিশফিশ ক'রে শেষে
আমি বলছি···

আর পৃথিবী
সত্যি
ঘোরে।

যুবরাজ হ্যামলেটের দুধদাঁত

তার দাঁত প'ড়ে গেলো দুধের মতো
যেন ড্যাণ্ডিলায়নের রোঁয়া
আর সবকিছু পড়তে শুরু ক'রে দিলো,
যেন ছিঁড়ে গিয়েছে এক জপের মালা
অথবা সময়ের সুতো,
আর তার পর সারা রাস্তা শুধু অধঃপাত ;
মোড়ের কাছে সৎকার সমিতির গাড়ির চালক নৈশভোজ ফেলে ওঠে,
তার অন্ধ ঘোড়া পথ দেখিয়ে নিয়ে যায় তাকে, দুলকি চালে।
হ্যামলেট, আমরা আসছি।

তাড়া করা ছাড়া আর-কিছুর সময় নেই এখন—
শিখতে হবে যোগ, গুণের অঙ্ক,
শিখতে হবে ফেরেব্বাজি, ফিশফিশ উত্তর,
ধূমপান আর মিথুন,
শেয়ার কিনতে হবে পারমান্‌গানেট
আর ন্যাপথালিনের,
আর কিছুই নেই এর বেশি
আর, হ্যামলেট, শোনো, আমরা আসছি।

সন্ধেবেলায় তুমি শোনো মাতাল দিনেমারদের হল্লা
আর কেমনভাবে তারা মাড়িয়ে যায় পরাগরেণুভরা ফুল,
ভোরবেলায় টাইপরাইটার খটাংখট বার ক'রে দেয়
রাশি-রাশি আনুগত্যের চেক
কঙ্কালী আঙুলে,
দুপুরবেলায় কাগুজে বাঘেরা গর্জায়
আর সমিতিগুলো হিশেব করে ঘোড়দৌড়,
আর সব শেষ হ'য়ে গেলে
কতটুকু থাকবে বীজশস্য ?
হ্যামলেট, আমরা রাস্তায়, আসছি।

কিন্তু আমরা সেনার টুপির বদলে
একটা পাখি বসাবো মাথায়, বসাবো না ?
আমরা পার্কের মধ্য দিয়ে হেঁটে যাবো

আর এক লাল পাথরের ছায়ায়
('ঢুকে পড়ো এই লাল পাথরের ছায়ায়')
আমরা শিখবো
আবার ভেবে দেখতে ব্যাপারটা
ছোটোভাবেই,
কেমন ক'রে গজায় শ্যাওলা,
কেমন ক'রে স্পঞ্জ চুষে নেয় জল,
কিংবা আমরা হাঁটতে বেরুবো একটু
শহরের বাইরে পাঁচ মিনিট,
হ'য়ে উঠবো ছোটো, আরো-ছোটো,
বুকে বসাবো পেসমেকার,
খুব সহজ ছন্দে সুর মেলানো,
যাতে নেকড়েরা পেট পুরে খায়, আর ছাগল তো এখনও আছে ওখানে,
আমরা শপথ করবো একটু
আর মিথ্যেকথা বলবো একটু,
কেননা মিথ্যে-না-বলিয়েদের জোগান খুব কম,
সাহসী ছেলেরা, পৃথিবীর যারা নুন,
আমরা আমাদের তালগোলপাকানো আশা নিয়ে
কোনো এক সুদিনে
আমরা নির্ঘাৎ প্রমাণ করবো আমাদের নুন,
হ্যামলেট।

আর তোমার ও-দাঁত তুমিই রাখো।
এই তো হ'লো গিয়ে পুরো ব্যাপারটা।

ওলসানির য়িহুদি গোরস্থান, কাফকার কবর, এপ্রিল, রৌদ্রোজ্জ্বল

মেপল গাছের তলায় লুকিয়ে আছে
নিঃসঙ্গ কয়েকটা নুড়ি
ছড়িয়ে-পড়া কথার মতো।
নিঃসঙ্গতা এত কাছে
যে সে নিশ্চয়ই পাথরের তৈরি।

ফটকের কাছে যে-বুড়ো লোকটা,
যে-একজন গ্রেগর সামসা
রূপান্তরিত হয়নি,
নগ্ন আলোয
চোখ পিটপিট করছে,
সব প্রশ্নের উত্তব দিচ্ছে এই ব'লে

দুঃখিত, আমি জানি না।
আমি প্রাহার লোক নই।

য | দি | ও

যদিও কবিতা জেগে ওঠে তখন, যখন আর-কিছু করার নেই; যদিও কবিতাই শৃঙ্খলাসৃষ্টির শেষ চেষ্টা, বিশৃঙ্খলা যখন অসহনীয়;
যদিও কবিরা তখনই সবচেয়ে জরুরি হ'য়ে ওঠেন, যখন স্বাধীনতা, খাদ্যপ্রাণ গ, যোগাযোগব্যবস্থা ও প্রচারযন্ত্র, নানা বিধিনিষেধ ও জরুরিঅবস্থা এবং অতি-উত্তেজনাসারানো চিকিৎসারও সবচেয়ে প্রয়োজন; যদিও শিল্পী হওয়া মানেই ব্যর্থ হওয়া আর শিল্প ব্যর্থতারই বশম্বদ— যেমন বলেছেন স্যামুয়েল বেকেট;
কবিতা, তবু, মানুষের শেষ কাজগুলির নয়, প্রথম কাজগুলির অন্যতম।

এখানে ওখানে
পোষমানা নুড়ির এক সমভূমির উপর
পেশল পুরোবাহুর সুকঠোর বিন্যাস
মাটি ফুঁড়ে অঙ্কুর বার ক'রে ছায়
আর ফুলের মতো ফুটে ওঠে
মস্ত মাংসল মুঠো।

মুঠো থেকে মুঠিতে
ডাইনিপুরুৎ খুঁজে বেড়ায়
যদি মাটিতে কোনোখানে কোনো গর্ত থাকে

যার তলায় মুখ নুইয়ে সে ফিশফিশ ক'রে বলতে পারবে
দুঃখিত, কিন্তু তোমার নখগুলো
নোংরা।

যদিও কবিতা হ'লো নিতান্তই এক ছোটো শব্দযন্ত্র / যেমন বলেন উইলিয়াম কারলোস উইলিয়ামস / সামান্য-এক ছোটো শব্দযন্ত্র, যে টিকটিক ক'রে বেজে চলেছে যাবতীয় মহাযন্ত্র মহাভার আর মহাতড়িৎপ্রবাহের জগতে ;

যদিও অন্যকোনো জগতের চেয়ে কবিতার জগতে বেশিভালোভাবে কেউ বাঁচে না ; যদিও কবিতার জগৎ রুক্ষ ও বিষাদময়, আধ্যাত্মিক ইতিহাসের উষর নিরানন্দে যার সৃষ্টি ও বিলয় ;

যদিও শিল্প কোনো সমস্যার সমাধান দেয় না, বরং জামার মতো গায়ে দিয়ে-দিয়ে তাকে জীর্ণ ক'রে ফ্যালে, যেমন বলেন সুজান সনটাগ ;

তবু কবিতাই একমাত্র তরোয়াল ও ঢাল ;

কারণ কবিতা আসলে স্বৈরাচারী, স্বতশ্চল শকট, উন্মত্ততা, কর্কটরোগ বা মৃত্যুতোরণের প্রতিপক্ষ নয়—বরং কবিতার লড়াই তারই সঙ্গে যা সবসময়েই ছিলো—ভিতরে-বাইরে সবসময়, সামনে-পিছনে সবসময়, মাঝখানটিতে সব-সময়—সবসময় যা আছে আমাদের সঙ্গে আর আমাদের বিরুদ্ধে !

কবিতা শূন্যতার বিরোধী। শূন্যতার মধ্যে কবিতাই অস্তিত্ব। তার যুদ্ধ সহজাত ও হাতফেরতা শূন্যতার বিরুদ্ধে—প্রাথমিক আর মাধ্যমিক শূন্যতার বিরুদ্ধে।

La Durée Créatrice ১

সন্ধ্যার বাতির তলায়
দড়িপাকানো শিরার শুষ্ক কঠিনতায়
সুমধুর একটানা ঢক্কানাদ।

বাইরে ওখানে গত বছরের উঠোনের ওপর
ভালোবাসা
যেন ওলটানো এক
বসন্তবাড়ির টেবিল
যার ওপর
ঝ'রে পড়ে পাগল তুষার
আর গ'লে যায়।

১ সৃষ্টির সময়।

শূন্যতার সীমা : যেখানে মানুষের সীমানা ফুরোয়, সেখানেই শূন্যতার সূচনা। বিন্যাস ও নির্ধারণের সূত্র, দৃষ্ট ও মৃত বস্তুর পচন ও রূপান্তরের বিরুদ্ধে কোনো পরিকল্পনা রচনার সূত্র—এই তো মানুষের সীমানা। মানুষের সীমানা বাড়ে, কমে, তার আছে সংকোচ-প্রসার—তার ধমনীতে শক্তির প্রবাহ।

আর শূন্যতা সেখানেই বৃহত্তম, যেখানে মানুষ ছিলো—সেখানে নয়, যেখানে সে ছিলো না। নক্ষত্রমণ্ডলগত যে-অন্তরিক্ষ, তা শূন্য নয়; কিন্তু একটা পোড়ো-বাড়ির মতো শোচনীয় শূন্যতা আর-কিছু নেই।

কিংবা কোনো কাজেই লাগলো না যে-চিন্তা।

নক্ষত্রমণ্ডলীকে নিরীক্ষণ ক'রে আমরা অনুভব করি এমন-এক শূন্যতা যা তাদের নয়।

ক. অনিশ্চয়তার
মেরুর দিকে ধাবমান
এক তপ্ত স্রোতে
ভেসে আছে এক মস্ত তুষারটিলা !

খ. পোস্তদানার মতো
এক উপকূলে
এক বাতিঘর, মরীয়া, হতাশ।

গ. প্রাক্-বিদ্যালয় সংগীত ;
অজানা দেশের লোকেদের অপভাষা ;
দিনপঞ্জির পাতায় হিজিবিজি :
যেন একটি ফিতে পিছনমুখো বাজিয়ে শোনানো হ'লো।

ঘ. ছোট্ট-এক আগুন ঘাস খেয়ে ফ্যালে
আর শজিবাগানের উপর দিয়ে
হাওয়ায় ভেসে যায়
এক সামরিক বিলাপ।

ঙ. সমভূমির ওপর
বন্দুকের আওয়াজ, আগুন।

চ. আর বিজয়ীরা
বাস্তিল থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে।

ছ. কারণ ভেতরে
সব সেই একই রকম।

শূন্যতা কখনো বিপর্যয় বা বন্যার মতো এগিয়ে আসে না। শূন্যতা চুঁইয়ে-চুঁইয়ে ভিতরে ঢোকে। চুঁইয়ে ঢোকে সারানো হয়নি এমন ছাত দিয়ে কিংবা নোংরা ডেস্ক দিয়ে। চুঁইয়ে ঢোকে রাস্তার ফাটলে, স্বপ্নের ফাটলে ; যে-সবখোল চাবি দিয়ে শূন্যতাকে খোলা যায় তার নাম যাক-গে-আমার-কিছু-এসে-যায়-না। শূন্যতা নয় পুরুষত্বহীনতার জ্ঞান, সে পুরুষত্বহীনতার দাবি। নির্বীজ হবার অধিকারের স্বীকৃতি, চাহিদা। নির্বীজ হবার উৎকাঙ্ক্ষা।

শূন্যতা মাত্র 'একফোঁটা জল যাকে আমরা ভাবি প্লাবন ব'লে,' নিয়ম অনুযায়ী যার আসার কথা ছিলো আমাদের পরে।

টেবিলের ওপরে ঝুলে থাকে ভেসে বেড়ায় এক অদৃশ্য শিখা।
কোনো-কিছুর উপাদানের সঙ্গে
নাস্তির সাগ্রহ মিশ্রণ,
যা নেই যা বলা হয়নি এমন-কিছুর সঙ্গে
যা আছে এমন-কিছুর—
এক গোপন ঝিল্লিফাটানো নোংরার।

প্রক্রিয়া চলতে থাকে
এক কান দিয়ে
আরেক কানের বাইরে—
মগজ চিবিয়ে খায় বিষাক্ত ভুট্টা
আর কাচের দেয়ালের আড়ালে নর্দমার এক ডাকসাঁইটে ধেড়ে ইঁদুর
ফুলে ফেঁপে ওঠে
নাপিতদের লালমুখো পৃষ্ঠপোষকের মতো:
নম্র ও ভব্য—ধমনীর বিরতিহীন ছিদ্র।

আমরা বেড়ে উঠি, ভস্মে রূপান্তরিত হ'তে-হ'তে।

আর ভাঁজগুলোর মধ্যে, ব্যক্তির ওপর
নৈর্ব্যক্তিকতার একাক্ষর হরফের খোদাই,
ধীরে-ধীরে জ'মে যায় স্তব্ধতার অম্লজানের মিশ্র,
আর আত্মসমর্পণের তরল অম্লজানের মিশ্র।

কিছুই এসে যায় না।

সোনার টুকরোটাও থাকবে না ওখানে। পরশপাথর পরিকল্পনায় ছিলো না
খাতাগুলোর ছবিগুলোর কুণ্ডলিপাকানো ধোঁয়া ঢুকে যায় মুখে।
কোনো কথা নেই ব'লে, আমরা হাততালি দিই

আর ভেতরে,
এই মনুষ্যচামড়ার আশ্রয়ের মধ্যে,
রূপ নিতে থাকে এক অতিকায় ভস্মমূর্তি,
চোখের জলে ঘেরা চোখ
কম্পমান শাদা ঠোঁট
রাত্রে যখন
নেচে ওঠে শিকড় শিস দিয়ে ওঠে তারা
সে বারে-বারে আওড়ায় সেই ফাঁকা ভস্মময় আদিম শব্দ :
পরে পরে পরে পরে

আর শূন্যতা শুধু কোনো-একজন লোকেরই মাথাব্যথা নয়, নয় কোনো বিচ্ছিন্ন ব্যক্তির ব্যাপার। তার বিশৃঙ্খলার জন্যই সে সকলের বিষয়, সকলের বিবেচ্য—জীবনপরিবেশ হিশেবে সে দানা বেঁধে ওঠে, শ্বাসের সঙ্গে ভিতরে ঢুকে যায়, বীজাণু ছড়ায়, সংক্রাম ঘটায়, বংশবৃদ্ধি করে বহুগুণ, ক্রমে হ'য়ে ওঠে মহামারী। যেখানে কোনো স্থায়ী আন্তর্মানবিক শৃঙ্খলার আত্মশোধনকারী শক্তি নেই; যেখানে কোনো আস্থা নেই ইতিহাসে, প্রাচীন সৌন্দর্যে বা জীবনের কোনো নবীন শক্তিশালী প্রতিচ্ছবিতে—সেখানেই তার দৃষ্টিকেন্দ্র। সেখানে নয়, যেখানে বস্তু ও চিন্তা কোনো নবীন সৃষ্টির উপর কোনো নব-মুদ্রিত শৃঙ্খলার উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল—বরং সেখানেই শূন্যতা, যেখানে কোনো নবীন সৃষ্টিতে পূর্ণতা নেই বা নেই কোনো শৃঙ্খলার বিন্যাসের স্থায়িত্ব।

সম্মিলিত গৃহস্থালি বীমাসংস্থা

সন্ধ্যা নিয়ে আসে প্রতিধ্বনি
হাৎড়ানির, ক্যাঁচকেচে শব্দের, বাঁশফাটা আওয়াজের
সব বাড়িঘর থেকে,
সব শহরতলি থেকে,
সব কবর থেকে।

ব্যস্ত ছোটো থাবাগুলি কষ্টেস্থষ্টে
বেয়ে-বেয়ে ওঠে চিরন্তনতার স্তম্ভ
যখন মাথাগুলো
ডুবে যায় তলায়।

যখন অন্ধকার ঢুকে পড়ে, হারকিউলিস
থপথপ ক'রে হাঁটে কাদার রাস্তায়,
দোরে-দোরে শুধোয়
জানো, কোথায় থাকে
শাশ্বত মুদ্দোফরাশেরা।

আমি মোটেই মনে করি না যে আমাদের অস্তিত্ব কোনো-কিছুর সারাৎসার, বরং আমাদের অস্তিত্ব কোনো সারাৎসার দিয়ে ভর্তি ক'রে দেয়াটাই আসল, তাতেই 'হওয়া', তাতেই 'প্রয়োজন', তাতেই আমরা সত্যি 'আছি'। অথবা আমি 'আছি'। কিন্তু যা আছে আর যা হওয়া উচিত, হওয়া আর হওয়ার পূর্ণবিকাশ—এ-দুয়ের মধ্যে কী যে অদ্ভুত সম্পর্ক। স্বপ্ন হ'লো যা অস্তিত্ব ও স্বপ্নদ্রষ্টাকে ছাপিয়ে যায়। স্বপ্ন হ'লো যা হওয়া উচিত। কিন্তু কোনো স্বপ্নকে ঘটিয়ে তোলার দিকে, তাকে বাস্তব ক'রে তোলার দিকে—এবং সেই জন্যেই তাকে ছাড়িয়ে যাবার দিকে—প্রথম পা ফেলবামাত্র তার আধেয় আর স্বাধীনতার নিছক অভিব্যক্তি থাকে না, হ'য়ে ওঠে বাধ্যতার লক্ষণ, বশ্যতার চিহ্ন। আর বাধ্যতা, দায়িত্ব—তাকে আমাদের খুব কঠোর ঠেকে, যদিও তারাই আমাদের স্বাধীনতার উপচার: সার্থকতার যে-ধারণা যে-অনুভূতি নিয়ে বই লেখা শুরু হয় তা দিয়ে কোনো বই শেষ করা কী অসাধারণ ব্যতিক্রম। কী কঠিন কোনো বন্ধুতা বজায় রাখা সেই একই শুদ্ধতা দিয়ে যে-শুদ্ধতায় তার সূচনা হয়েছিলো। কী কঠিন কোনো ছাউনি তৈরি করা প্রথম দুটি তক্তার সমান মাপের তক্তা দিয়ে।

শুধু-যে বাস্তবতা আর স্বপ্নের মধ্যেই আততি, অধিজ্যতা, তা নয়—স্বপ্ন আর স্বপ্নের রূপায়ণেও তার উপস্থিতি।

আর শেলাইতে যখন টান পড়ে, শূন্যতা জেগে ওঠে।

আততি, যা পূর্ণতার দিকে চালিত করে, থেকে যায় স্বপ্নের পূর্ণতাতেও। টিকে থাকে আততি, সবসময়, বিভীষিকা ছড়ায়। কঠিন ক'রে তোলে। হ'যে ওঠে স্থায়ী চিহ্ন, অঙ্গদ। তখন আর তা উদ্দীপক থাকে না, হ'য়ে ওঠে নিরাশা। আর শেলাইতে টান পড়লেই শূন্যতা জেগে ওঠে।

নিজেই যা বেছে নিয়েছি তার ক্ষেত্রেও আমরা স্বাধীনতা দাবি করি। কিন্তু এই স্বাধীনতা নিজেরই বিরুদ্ধে যায়। এই স্বাধীনতা মানে প্রায়-স্বাধীনতা—অসম্ভাব্যতা আর অবাস্তবতায় বন্দী; নিষ্ফলতায় বন্দী।

আর, এই কি তা, যা মানবিক? কোত্থেকে আসে মানবিকতার এই অনুভূতি আর শেষে এই ধারণা? মানবিকতার ধারণা—স্ববিরোধী স্বাধীনতাতেই যে বেঁচে আছে—বেঁচে আছে এমন-এক স্বাধীনতায় যা আমাদের স্বপ্নের কাছে বিশ্বাসঘাতকতা করে, আমাদের আত্মবিকাশের সূচনাকে বিশ্বাসঘাতকতা করে,

আমাদের রীতিশৃঙ্খলাকে বিশ্বাসঘাতকতা করে। আমাদের আত্মবিকাশের সব প্রমাণের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় এই স্বাধীনতা—বিজ্ঞান কথাটার সবচেয়ে বিশদ যে-অর্থ তার সাক্ষীসাবুদের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় সে।

এই রোমান্টিক মানুষ মানুষই নয়, বরং মানুষ থেকে পলায়মান কোনো জীব—অস্তিত্বের পূর্ণবিকাশ নয়, বরং এমন মানুষে হ্রাসপাওয়া, যার না-আছে চাহিদা, না-কোনো পূর্ণতা, না-কোনো সারমর্ম।

হ্যাঁ ;
তবু তারপর এলো
কত রাজমিস্ত্রি,
ডাক্তার,
ছুতোর,

এমন লোক যাদের হাতে আছে শাবল,
এমন লোক যাদের আছে অপরিমিত আশা,
এমন লোক যাদের গায়ে জড়ানো ছেঁড়া ন্যাকড়া,

হাত বুলোলো
বুনো বাড়ির কুঁচকিতে,
অন্তরিক্ষের ধ্বকধ্বক হৃৎপিণ্ডে,
হাত বুলোলো ব্যথার চুড়োয়,

যতক্ষণ-না ফিরে এলো সব ইট
যতক্ষণ-না ফিরে এলো টপটপ-ঝরা রক্তের ফোঁটা
অম্লজানের সব অম্লকণা
আর পাথর
ক্ষমা ক'রে দিলো পাথরকে।

স্বাধীনতা নয় শূন্যতার কাছে প্রত্যাবর্তন, বরং তা অস্তিত্বের পূর্ণবিকাশ। স্বাধীনতা নয় সম্মেলন বা সীমানানির্দেশ থেকে পশ্চাদপসরণ, বরং সবকিছুর পারস্পরিক যোগাযোগের উচ্চতর রূপ। আর নির্ভরতার। তা না-হ'লে উলটো দিক থেকে নবজাত শিশু হ'তো বেটোফেন বা কোমেনিউসের চেয়ে বেশি স্বাধীন; আর বনবেড়াল হ'তো নবজাত শিশুর চেয়ে বেশি।

স্বাধীনতাই শেষ লক্ষ্য আর সভ্যতা-সংস্কৃতির শর্ত চুক্তি বন্ধন; যে-স্বাধীনতা মানুষের অতীত অবস্থায় ফিরে যাবার উৎকাঙ্ক্ষায় দূরযাত্রী তা হ'লো স্বভাব-বিকাশের বিপরীত; তা না-হ'লে বাঁদর থেকে মানুষ হ'তে গিয়ে এত কাটাচেরা টানাহেঁচড়া আমরা মেনে নিলুম কেন?

মানুষের সীমা বেঁধে দেবার উচ্চতর রূপগুলোর সন্ধান হিশেবে স্বাধীনতা নিশ্চয়ই আধুনিক মানুষের পূর্ণবিকশিত চৈতন্যকেই ধ'রে নেয়—মানুষের মগজের নেশাতুর ধূসর বস্তুর উপগোলক নয়, কিংবা নয় শটনক্রিয়ার ঘুণপোকার বনফুলের আর যৌনসংগমের আদিম প্রকৃতির মধ্যে রাশ-আলগা প্রাতিস্বিকতা। আমরা নাগরিকদের সামূহিক চৈতন্যকে সুবিধেমতো যথেচ্ছ ঘোরাতে মোচড়াতে পারি না, যেমন পারি টি. ভি. কে। কিংবা রাজনীতিকে।

স্বাধীনতা—কত সহজে দেয়া যায় তার সংজ্ঞার্থ: স্বাধীনতা স্বৈরাচারের বিরুদ্ধ মাত্রা, সমাজবদ্ধ মানুষের নতুন আয়তন, মানুষ আর সমাজের নতুন সংজ্ঞার্থ; স্বাধীনতা হ'লো আত্মনিয়ন্ত্রণ, কোনো একনায়কের সব শলাষড়যন্ত্রের চেয়েও যা কঠিন; যার দাবি, সর্বগ্রাসী, আত্মনিয়ন্ত্রণ। স্বাধীনতার দাবি—যা একনায়ক স্বৈরাচারী আর ময়দানের রাস্তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়, যা শারীরিক ঝাঁকুনি আর রাজনৈতিক অর্থনীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়—কিন্তু নিজের বিরুদ্ধেও দাঁড়ায় সটান—নিজের সঙ্গেই তার লড়াই, আর-কিছুর সঙ্গে নয়। আর এইভাবেই স্বৈরাচারীদের জন্য সব এত সহজ ক'রে দেয়।

কোনো ভবঘুরের চেয়ে ঢের বেশি স্বাধীন, যে ম্যারাথনে দৌড়েছিলো। কোনো ঊর্ধ্বচর মুনিঋষির চেয়েও অনেক বেশি স্বাধীন একজন গ্রহযাত্রী।

কবিতা না-লিখে ঘেউ-ঘেউ করলেই মানাতো বেশি—কিংবা সান ফ্রানসিস্কো অথবা প্রাহায় না-থেকে থাকা যেতো কুষ্ঠরোগীর আশ্রমে।

গিয়ে
তাকে তুলে নিলেন,
তাকে নিয়ে এলেন
চকমকি স্ফটিকের
এক পাত্রে,
হাতে অদাহ্য অংশুল খনিজের দস্তানা,
তাকে নিয়ে এলেন উদাসীন অন্ধকারে।

তাদের দেখিয়ে দিলেন এই
নীললোহিত
সানন্দ
শিখা, গভীর তাঁর উদ্বেগ এই জেনে যে
এ কোনোই কাজে লাগবে না—
যা ভেবেছিলেন এটা তা নয়।
কিন্তু যা ভেবেছিলেন, তা ছিলো ঠিক তা-ই
প্রথম শিককাবাবের
গন্ধ পাওয়া যায়
আর প্রথম বিধর্মীর
প্রজ্বলন্ত পায়ের।

থোড়াই পরোয়া করলেন জ়িউস,
আর হেরা
সত্যি-বলতে বেশ পছন্দই করেছিলেন।

তিনি, প্রমেথেউস,
ফিরে এলেন
মাথায় ভাবনা কী ক'রে বানাবেন
ফুৎকারজ্বলা মশাল।

কিন্তু সব গেলো ভণ্ডুল হ'য়ে,
আর শুধু শেকল
গজিয়ে উঠলো আগুল্‌ফ,
আর কব্জিতেও,
আর তাঁর শাদা চুলের মাথা থেকে
উড়াল দিলো এক বাজপাখি
আর ঠোকরালো আর ঠোকরালো।

সন্দেহ নেই, কবিতা নেহাৎই এক খেলা।
সন্দেহ নেই, কবিতা শুধু বাঁচে তার জন্মের মুহূর্তে আর পড়বার মুহূর্তে, আর খুব বেশি হ'লে স্মৃতির আলোছায়ার খেলাধুলোয়।
সন্দেহ নেই, একই কবিতায় কেউই দু-বার প্রবিষ্ট হ'তে পারে না।
সন্দেহ নেই, কবি গোড়া থেকেই আন্দাজ পেয়ে যান যে কোনো উদ্দেশ্যই তার নেই, যেমন বলেছেন হেনরি মিলার।
সন্দেহ নেই শিল্প তখনই জনসাধারণের গ্রহণযোগ্য হয় যখন তার পতন হয় নিছক যান্ত্রিকতায় আর তার নিয়মকানুন পর্যবসিত হয় নিছকই অভ্যাসে।
তবু তার উদ্দেশ্যহীনতায়, শব্দের প্রতি তার মরীয়া নাছোড় আনুগত্যে, তার জন্ম-পুনর্জন্মের আদিম শৃঙ্খলায়, কবিতাই হ'লো সবচেয়ে বড়ো জামানত, যে আমরা এখনও কিছু করতে পারি, যে শূন্যতার বিরুদ্ধে এখনও আমাদের কিছু করার আছে, যে আমরা এখনও হাল ছেড়ে দিইনি, বরং কোনোকিছুর কাছে এখনও নিজেদের উৎসর্গ করতে পারি।
সবচেয়ে বড়ো জামানত, যে আমরা কেবল তথ্য-সংবাদের সংরচনা নই—সেইসব তথ্যের, যেমন বলেন এর্নস্ট ফিশার, যারা কাজ ক'রে-ক'রে শুকিয়ে পরিণত হয়েছে বস্তুতে!
অবশ্য এই শর্তে, যে কবিতাকে টুকরো-টুকরো হ'য়ে-যাওয়া অন্তত একটুক্ষণ ঠেকিয়ে রাখার জন্য কবির যা সকাতর সামান্য চেষ্টা, এই শর্তে, যে তাকে ভাবা হবে না পরশপাথর ব'লে, যা স্তম্ভিত মানবজাতিকে মুক্তি ও মোক্ষ এনে দেবে।
কারণ শিল্প কোনো সমস্যার জট খোলে না, সমাধান দেয় না, বরং তাকে গায়ে দিয়ে-দিয়েই জীর্ণ ক'রে ফ্যালে।
কারণ শিল্প শুধু ব্যর্থতার কাছেই বিশ্বস্ত।
কারণ যখন কিছুই আর থাকে না, তখনই কবিতা।
যদিও…

আমরা, যারা হেসেছিলুম

ক্লাস, ময়দান,
জুয়োর আড্ডা,
ফাটকা বাজার, দোকান-পাট,
টেলিভিশনের পর্দা আর
সোনালি ফ্রেম থেকে
আর কোনো
ইতিহাস থেকে
আমাদের ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বার ক'রে দেয়া হ'লো
            আমরা
            যারা হেসেছিলুম।

নগর বারফট্টাই ক'রে
আরো দুই তলা বাড়লো,
আর টেলিফোনে-আড়ি-পাতার-যন্ত্রগুলো
আরো ভালোভাবে আড়ি পাতলো
স্তব্ধতায়
আর দারোয়ান
রাখলো আরো কড়া নজর
আর প্রেম হাত বাড়ালো ছুরির দিকে
আর ছুরি ধেয়ে এলো রক্তের লোভে
স্তব্ধতায
আর ধেড়ে ইঁদুরগুলো হ'য়ে উঠলো
আরো-ধাড়ি আরো-ইঁদুর মার্কা। যারা কখনো হাসে না।
যখন আমাদের তাড়িয়ে দেয়া হ'লো
            আমরা
            যারা হেসে উঠেছিলুম।

কতগুলো টেরোড্যাকটিল

চক্কর দিচ্ছিলো ভারি মেত্বর আকাশে
আর ঘোড়ার ল্যাজের লোম আর শ্যাওলা
গজাচ্ছিলো ফুলের টবে
আর এক বিলাপমুখর প্রাগৈতিহাসিক
পুরভবন থেকে তাকিয়ে দেখছিলো
আমরা ফিরে আসছি কি না
আমরা
যারা হেসে উঠেছিলুম।

আমরা ফিরে আসছিলুম না।
গুদোম আর কারখানা
নাটবলটু যন্ত্রপাতির দোকান আর ফালতু পরিত্যক্ত ধাতুর স্তূপ
অশ্লীল লেখাওলা দেয়াল
আর ফাঁকা পোড়োবাড়িগুলোর মধ্য দিয়ে
আমরা খ'য়ে-যাওয়া শানবাঁধানো রাস্তায় হাঁটছিলুম
এক পা এক পা এক পা
টাকুর মতো শূন্যতা দিয়ে
ঝোপঝাড়ের মধ্য দিয়ে ছুঁচোর ঢিবির মধ্য দিয়ে
আর
মাইনপাতা মাঠের উপর দিয়ে
আর
কে যেন টাল শামলাতে না-পেরে থুবড়ে পড়লো
স্তব্ধতায়…আর তারপর কিছুই না। শুধু স্তব্ধতা।
আমরা সেইজন্যেই হেসে উঠেছিলুম।

অ | নু | চি | ন্তা

অণুচিন্তা বিষয়ে অণুচিন্তা

অণুচিন্তাগুলি কিন্তু যথার্থই অণুচিন্তা। সেই সূত্রানুসারে, ইহারা কবিতা নহে, গল্প নহে, নহে সম্পাদকীয় অথবা সাপ্তাহিক মন্তব্যের স্তম্ভ। (সম্পাদকেরা এই 'নহে' ব্যাপারগুলা আদৌ পছন্দ করে না, তাহারা বারে-বারে 'কবিতা'ই দাবি করে, কারণ লাইনগুলি ছোটো-ছোটো, পক্ষান্তরে চিন্তাগুলি কেমন যেন সকাতর, আর সমালোচকেরাও তাহাতে চটিয়া যান।) যে-সব কবিতা হাওয়ায় মিলাইয়া গিয়াছে তাহাদের ঝরতি-পড়তি অথবা স্মরণকোষ হিশাবে কেহ নিজের সুষুম্না-গ্রন্থির ক্ষার-রসের মধ্যে চিন্তাগুলিকে লালিত করে, ইহারা বস্তুত ধরতাই-যত ছাঁচে ফেলা জিনিশেরই ইচ্ছাকৃত নমুনা। যদি তাই চিন্তাগুলি মাঝে-মধ্যে এমন রূপ ধরিয়া বসে যাহা কবিতাকেই মনে করাইয়া দেয়, সে তবে এই জন্যই যে কবিতা গদ্যের চাইতে মুখের কথার অনেক কাছাকাছি। কবিতা লেখা যায় স্কুলের খাতায়, গাছপালায়, মেঘের পাঁজায়, এবং একমুখী রাস্তাগুলির ফুটপাথে, তাহাই মনোমতো। ইহা তো ঠিক, সাহিত্য আসলে সেই সংবাদ চিরকাল যাহা সংবাদ থাকে, যেমন বলিয়াছেন এজ়রা পাউণ্ড।

পাইক মাছ কবেই মরিয়া ভূত হইয়া গিয়াছে বটে,
তবে থাকিয়া গিয়াছে তাহার দাঁতের পাটি—
অণুচিন্তাগুলি সম্বন্ধে এই কথাই বলিয়াছে লোককথার
প্রজ্ঞা, তাহারা লিখিত হইবার একশত বৎসর পূর্বেই।

সারূপ্য বিষয়ে

দিনের পর দিন কিছুই নিজেকে পুনরাবৃত্তি করে না।
নদীরা নহে, প্রবক্তারা নহে, ছাগলেরাও নহে।

এবং যদি এই আজকের দিনটি হুবহু আগামীকাল হইয়া ওঠে,
সে অবশ্য ঐরূপ হইবে না, সবকিছুই কিন্তু

চিরকাল একই রকম থাকে না। কেননা
যেই কোনো-একটা জিনিশের বদল হয়, অন্যসবকিছুও
বদলাইয়া যায়। বস্তুরা তো আর নিঃসঙ্গ নহে,
তাহারা নিবিড়ভাবে অন্যসবকিছুর উপর নির্ভরশীল।

অথবা অংশত তাহাদের উপর নির্ভর করে। সেইজন্য,
বোঝোই তো, কেহই জানে না…

এমনকী প্রবক্তারাও এই সুনির্দিষ্ট সম্বন্ধ শৃঙ্খলের
অংশ। তেমনি কথারাও। তেমনি ছাগলেরাও,
তেমনিই দুধ। তেমনি রক্ত।

কাজেই চিনিয়া ওঠাই বিশেষ মুশকিল—তা সে তোমার
নিজের কথাই হোক, অথবা তোমার নিজের
রক্ত, তোমার নিজস্ব প্রবক্তা এবং তোমার ছাগল।

বিশেষ মুশকিল। কিন্তু বারংবার
আমরা চেষ্টা করি চিনিতে, যাহাতে প্রবক্তাদের কাছ হইতে
ছাগল এবং রক্তের কাছ হইতে দুধ না-জুটিয়া যায়।

বস্তুর সারূপ্য আমরা ভান করিয়া বসি,
আমাদেরই নিজস্ব দ্বিতীয় সত্তায় পরিণত করিয়া দিই তাহাকে,
আর ধীরে-ধীরে কুচকাওয়াজ করিয়া চলিয়া যাই
সময়ের অন্ধকার পাতালে।

রং বিষয়ে

নীল নিশ্চয়ই চার সংখ্যাটি কিংবা এমনকী
স্বরবর্ণ ও, পাখিরা এবং স্বদেশ ইথাকার
ধোঁয়ার কুণ্ডলি সমেত।

শাদা তবে এক সংখ্যাটি, হুবহু স্বরবর্ণ ই যেমন
অন্তত যতক্ষণ সে বাহিরে ঠাণ্ডায় কাঁপে, যতক্ষণ সে
অগ্নিত হইয়া ওঠে নাই।
তারপর ইহা আরো বোঝায় ফুলেদের ভবিষ্যৎ,
পুথিপত্রের অতীত ; পৃথিবীর অন্ধতা
অদ্যাবধি অস্বচ্ছ। শুদ্ধতা।

কালো হইতে পারে সংখ্যা নয়, অন্তত যতক্ষণ সে
অতিমার্জিত সংখ্যাদের শৃঙ্খলাভুক্ত নহে ; জোড় সংখ্যাগুলি
ফিকা হইয়া যায়, যদি তাহারা হয় পরিশীলিত ; তুমিও
কখনো-কখনো কালো হইতে পারো, কৃষ্ণত্ব
মাথার খুলির ন্যায় পাহাড়ে-কন্দরেও ঘটিতে পারে ;
হ্যাঁ এবং রীতিমাফিক এবং বস্তুর রোষে।

লাল অপর পক্ষে হইল তিন, এবং পাঁচ যখন হয়
লালের পোঁচ একটু কমিয়া যায়, হইয়া ওঠে আরো-খয়েরি।
স্বরবর্ণ আ এমনই লাল
যেন তাহা কোনো ক্ষুদ্র প্রাণীর হা-করা মুখ। তাছাড়া,
যুদ্ধও লাল আর ফাউস্টের লেখনীও আর বসন্তকালের
প্রণয়ও। এবং আশার ঢক্কানিনাদ।

অতএব, আমাদের কাছে আছে চারটি বর্ণের একটি সমীকরণ।
৪=১.৯-৫, ঠিক যেন বিষুবায়নের সময়
সমুদ্রতীরবর্তী জলপাইকুঞ্জ এবং দুই যুদ্ধের
অন্তর্বর্তীকাল, যাহা খুব বেশি হইলে বছরে মাত্র একবারই ঘটে।

আশ্চর্য কী যে কর্তারা কবিতাকে ভালোবাসে না আর পাহারাদারেরা
ঠায় দাঁড়াইয়া থাকে ছায়ায় যেখানে কেউই দেখিতে
পায় না যে

বর্ণের সুনির্দিষ্ট রীতিশৃঙ্খলা সম্বন্ধে তাহারা কতটা উদ্‌বিগ্ন।

শার্লমেন বিষয়ে

বাহিরে, ফটকের সামনে, ঝুলিতেছে একটি ঘণ্টা। খর্বাকৃতি পেপিন-এর পুত্র শার্লমেন ঐখানে ইহাকে টাঙাইয়াছেন। যাহারা অন্যায়-অবিচারে ভুগিয়াছে তাহারা ঐ ঘণ্টা বাজাইতে পারে, এবং শার্লমেন, ঘণ্টাধ্বনি শুনিবামাত্র রাজাগিরি স্থগিত রাখিয়াই, তৎক্ষণাৎ, তাহাদের ডাকিয়া পাঠান, তাহাদের কথা শোনেন এবং

ন্যায়বিচার বিলি করিয়া দেন।

ইহা ঘটিয়াছিল ৮০০তে।

এই বৎসর ঘণ্টা বাজিয়াছিল।
বৃষ্টির ভিতরে, ভিজিয়া একশা নহে বরং
ধ্বসিয়াই পড়ে বুঝি,
এবং এগারোশো বৎসর টিকিয়া থাকিয়া,
কাকভিজা, গোল্লায়-যাওয়া, কেমন ভেড়ুয়াগোছ,
ভাঁড়ের পোশাকে,
দাঁড়াইয়াছিল শার্লমেন।

ভাঙা-ভাঙা ফ্র্যাংকিশ ভাষায়, সে দাবি করিয়াছিল
শুনানি।

পোকামাকড় বিষয়ে

পোকামাকড় বস্তুত খুব ভালোভাবে নির্মিত হয় নাই। এই গোটা-দুই
জোড়ের বদলে ইহাদের দরকার আরো-ভালো কঙ্কালকাঠামো,
আরো-ভালো নিশ্বাসপ্রণালী এবং আরো-ভালো
কেন্দ্রীয় স্নায়ুপ্রক্রিয়া। এতদনুসারে যদি উন্নতি সাধিত হয়,

ডুবুরি গুবরেপোকারা তবে শুরু করিতে পারে সৎকার সমিতি,
আরশোলারা লুঠ করিতে পারে ব্যাঙ্ক, পিঁপড়েদের

লাগানো যাইতে পারে মহাকাশযাত্রার কর্মযজ্ঞে, আর
মাছিরা তাহাদের আয়ত লোচনে তত্ত্বাবধান করিতে পারে
সারা জগৎ এবং সিদ্ধান্তও লইতে পারে,
হ্যাঁ অথবা না,
ভালো অথবা মন্দ,
পদোন্নতি, নতুবা শাস্তি।

পোকামাকড়েরা তখন, ল্যাজবদল ও ডি.-ডি.-টির হাত হইতে রেহাই পাইয়া, মানুষের উন্নতি-বিষয়েও চিন্তা করিতে পারে, যাহারা খুব-একটা ভালোভাবে নির্মিত হয় নাই।

গাভী বিষয়ে

আমাদের বিশ্বাস যে গাভীর জীবনের লক্ষ্য হইল গাভী হইয়া ওঠা। ইহা অবশ্য তেমন কঠিন কাজ নহে, বিশেষত যখন আমরা তৃণভূমিতে আছি।

সমস্যা শুরু হয় কশাইখানার পথে। এখন আমরা
অনুভব করি অজ্ঞাত ভয়, আর পাতালের রাক্ষসেরা
ছিঁড়িয়া খায় আমাদের জঠরের অন্তঃস্থল, চর্বিভরা
হৃৎপিণ্ড ও আমাদের মগজের মণ্ডবৎশূন্যতা।

তখন আমরা লাথি ছুঁড়ি চারপাশে, শিকলে-বাঁধা মাথায় হ্যাঁচকা টান পড়ে :
নাম
আমাদের সকলেরই ভিন্ন-ভিন্ন। কিংবা গভীর চিন্তামগ্নভাবে
দাঁড়াইয়া, যাহাকে
কেহ-কেহ বলিতে পারে হালছাড়া আত্মসমর্পণ, বিষম
মুখগোমড়াভাব অথবা নিছকই মানসিক অন্ধকার।

প্রাচীন প্রজ্ঞা হইল হাঁদার হদ্দ—মুগুর বা হাতুড়ির তলা হইতে
কীভাবে পালাইতে হয়
তাহার কোনো হদিশ সে দেয় না।

তাই আমরা গাভী হইয়াছি বলিয়া দুঃখ পাই, এক্ষেত্রে
সবকিছু সম্বন্ধেই যে
কত কম জানি। এখন আমরা অন্যকারু চামড়ার তলায়
আশ্রয় চাই।
কোনো মানুষের চামড়ার ভিতরে। কিন্তু এ অবশ্য নিছকই গব্য ভাবনা।

এমনকী মানুষও মাঝে-মাঝে ভাবে—

বামনদের বিষয়ে

বিশাল বিস্তৃত জগতে
পালে-পালে যত বামন—
জগতের সর্বাপেক্ষা বৃহত্তম বামন
হইয়া উঠিতেছে।

এই-যে আসেন অতিলোহেনগ্রিন এক অতিমরাল
চড়িয়া, অতিচুরুটগুলার গানের তালে-তালে যাহারা
ওস্তাদ হইয়া উঠিয়াছে বিবাহযাত্রার সংগীতে, চমৎকার ভাবে চিরঞ্জীব।
স্বপ্ন আর কথার
ভূতাত্ত্বিক আস্তরগুলি নরম প্যারিসপলেস্তারা হইয়া ওঠে,
পায়ের তলায় যত মৃত ধ্বনি।

কাছের জগতে
প্রায়-চোখেই-পড়ে-না এমন-এক রাজকন্যা তুষারকণা
ইঁদুরদের রাস্তায় এ-পা ও-পা করে,
সেই সাতজন ভালোমানুষ বুড়ো বামনদের
তল্লাশে

আর খোঁজে তাহার নিজের
নিঃসঙ্গ
দুধদাঁতটিকে।

নির্ভুলতা বিষয়ে

গাছেরা
 ঘোরাফেরা করে ঠিক ঐ সময়ে
ঠিক যেমন
 পাখিদের আছে স্থানকাল সম্বন্ধে নিজস্ব সহজাত-বোধ।

কিন্তু মানবজাতি,
 সহজাত-বোধ বঞ্চিত বলিয়া, সহায়তা পায়
 বৈজ্ঞানিক গবেষণার, বর্তমান আখ্যানটি
 যাহার সারাৎসার প্রদর্শন করিবে।

জনৈক সৈনিককে
 প্রতিদিন সন্ধ্যা ছ-টায় একটি তোপ দাগিত হইত।
 সে তার কর্তব্য সম্পাদন করিত যথার্থ সৈনিকের ন্যায়। যখন
 তার কাজ সে সঠিকভাবে সম্পন্ন করে কি না,
 খতাইয়া দেখা হইল, সে বিবৃতি দিল :

শহরের প্রধান বিপণিকেন্দ্রে
 এক ঘড়িনির্মাতার দোকানের জানালায় একটি অতি-অভ্রান্ত
 ক্রনোমিটার আছে—আমি উহাকেই কাঁটায়-কাঁটায়
 অনুসরণ করি। প্রত্যহ সতেরোটা পঁয়তাল্লিশে আমি উহার
 সহিত আমার কব্জিঘড়িটা মিলাইয়া লই এবং পাহাড়চূড়ার
 দিকে অগ্রসর হই, সেখানে কামানটি প্রস্তুত থাকে। সতেরোটা
 উনষাট মিনিটে আমি কামানটির কাছে পৌছাই এবং ঠিক
 আঠারো ঘটিকায় আমি তোপ দাগি।

দেখা গেল
 যে তোপ দাগিবার এই প্রক্রিয়া অতীব অভ্রান্ত।
 এখন শুধু ক্রনোমিটারটি খতাইয়া দেখিলেই হয়।

শহরের প্রধান বিপণিকেন্দ্রের ঘড়িনির্মাতাকে উহার অভ্রান্ততা
বিষয়ে প্রশ্ন করা হইল।

ওহ্, এই কথা, ঘড়িনির্মাতা কহিল,
যন্ত্র যতদূর অভ্রান্ত হইতে পারে এই যন্ত্রটি তা-ই।
একবার ভাবুন, সে যে কত বছর যাবৎ এখানে রোজ ঠিক সন্ধ্যা ছ-টায়
একবার তোপ দাগা হয়। আর প্রতিদিন আমি
ক্রনোমিটারটির দিকে তাকাইয়া দেখি, আর সে সর্বদাই
ঠিক সন্ধ্যা ছ-টা দেখায়।

তো অভ্রান্ততার এই তো হইল যথাসর্বস্ব।
এবং মাছ ঘুরিয়া বেড়ায় জলে আর আকাশ ভরিয়া যায়
ডানার মর্মরে, যখন
ক্রনোমিটারগুলি করে টিকটিক আর কামান বজ্রনিনাদ।

গাছে বিড়াল গজায় এই তত্ত্ব বিষয়ে

সেই যেকালে গন্ধমূষিকেরা যখনও সভা ডাকিত
এবং চোখে ভালো দেখিতে পারিত, একদিন হইল কী,
উপরে কী থাকে জানিবার জন্য তাহারা বিষম ব্যগ্র হইয়া পড়িল।
এবং তাহারা তদন্ত করিবার জন্য এক কমিশন নির্বাচিত করিল।
কমিশন তাহাদের মধ্য হইতে তীক্ষ্নদৃষ্টি ক্ষিপ্রপদ ছুঁচোকে প্রতিনিধি
পাঠাইল। মাতা বসুমতীর গর্ভে তাহার জন্য যে-টুকবাটি
সুনির্দিষ্ট ছিল, তাহা ছাড়িয়া আসিয়া সে দেখিতে পাইল
এক গাছ, তাহাতে এক পাখি বসিয়া আছে।

এবং এইভাবে এক তত্ত্ব সংরচিত হইল যে ঊর্ধ্বে ওখানে
গাছে-গাছে পাখি গজায়। কিন্তু
কতিপয় গন্ধমূষিকের নিকট তাহা নিতান্তই সরলীকরণ
বলিয়া বোধ হইল। এবং তাহারা এক

দ্বিতীয় ছুঁচোকে নির্বাচিত করিল—গাছে-গাছে
সত্য-সত্যই পাখি গজায় কি না
তাহা জানিয়া আসিবার জন্য।
তখন সন্ধ্যাকাল, আর বিড়ালেরা
গাছের ডালে-ডালে খ্যাঁক-খ্যাঁক করিতেছিল। খেঁকানো বিড়ালেরা
গাছে গজায়, দ্বিতীয় ছুঁচো প্রতিবেদন দিল।
এবং এইভাবে উদ্ভূত হইল বিড়াল বিষয়ক একটি বিকল্প তত্ত্ব।

এই পরস্পরবিরোধী প্রতিবেদন কমিশনের এক
স্নায়ুরোগগ্রস্ত বৃদ্ধ সদস্যের নিদ্রা তছনছ করিয়া দিল।
পা টিপিয়া-টিপিয়া তিনি বাহির হইলেন,
উদ্দেশ্য : নিজেই তিনি সরেজমিন তদন্ত করিবেন।
তখন গভীর রাত এবং ঘুটঘুটে অন্ধকার।

উভয়েই ভ্রান্ত, মাননীয় গন্ধমূষিক ঘোষণা করিলেন।
পাখি আর বিড়াল—ইহারা উভয়েই দৃষ্টির বিভ্রম,
আলোর প্রতিসারণের ফল। বস্তুত, উপরটাও
এই তলাকার মতোই, কেবল উপরে মাটি লঘু ও ক্ষীণতর
আর গাছপালার উর্ধ্বচারী শিকড়েরা কী যেন ফিশফিশ করিয়া বলে,
তবে খুব সামান্যই।

আর সেইখানেই ব্যাপারটির বিরতি ঘটিল।

তাহার পর হইতে ছুঁচোরা মাটির তলাতেই থাকিয়া গিয়াছে,
কোনো কমিশনও নিয়োগ করে না, অথবা
কোনো মার্জারের অস্তিত্বও অনুমান করে না।

এবং যদি-বা করে, তবে খুব সামান্যই।

মানচিত্র বিষয়ে

আলবের্ট শেন্ট-গিওর্গি, মানচিত্র সম্বন্ধে তাহার বিস্তর জ্ঞান,
যে-মানচিত্রগুলি অনুসারে জীবন কোথাও বা অন্যত্র অগ্রসর হইতেছে,
সে আমাদের এই কাহিনীটি বলিয়াছিল, যুদ্ধের অভিজ্ঞতা,
যে-যুদ্ধের ফলে ইতিহাস কোথাও বা অন্যত্র অগ্রসর হইতেছে :
আল্‌প্‌স পাহাড়ের উপর এক হাঙ্গেরীয় বাহিনীর জনৈক তরুণ লিউটেনাণ্ট
আশেপাশে পর্যবেক্ষণ করিয়া দেখিবার জন্য একটি ছোটো দলকে
তুহিন পোড়োজমিতে প্রেরণ করিয়াছিল।
তৎক্ষণাৎ তুষারপাত শুরু হইল।
দুইদিন ধরিয়া অবিশ্রাম তুষার ঝরিল এবং দলটি
ফিরিয়া আসিল না। লিউটেনাণ্টটি মনস্তাপে মরে আর কি :
সে কিনা নিজের লোকজনদেরই মৃত্যুমুখে প্রেরণ করিয়াছে!

কিন্তু তৃতীয় দিনে জরিপ দলটি ফিরিয়া আসিল।
কোথায় ছিল তাহারা? কীভাবেই বা তাহারা পথ খুঁজিয়া পাইল?
সত্যিই, তাহারা বলিল, আমরা সত্যিই পথ হারাইয়াছি বলিয়া
ভাবিয়া বসিয়াছিলাম আর শেষ পরিণামের জন্য অপেক্ষা
করিতেছিলাম। আর তখনই হঠাৎ আমাদের মধ্যে একজন
তাহার পকেটে একটি মানচিত্র আবিষ্কার করিল। এবং
ইহাই আমাদের সুস্থির করিয়াছিল।
আমরা শিবির খাটাইলাম, তুষারঝড়টা সামলাইয়া লইলাম,
এবং তারপর মানচিত্রের সহায়তায়
আমাদের ঘাঁটিটা আবিষ্কার করিয়া লইলাম।
আর, এই তো, এখন আমরা এইখানে।

লিউটেনাণ্ট এই অসাধারণ মানচিত্রটি ধার করিয়া লইল
এবং ভালো করিয়া তাহা নিরীক্ষণ করিল। ইহা মোটেই
আল্‌পসের কোনো মানচিত্র নহে, বরং পিরেনিজের।

আচ্ছা, এখন তবে চলি।

আপেক্ষিকতার তত্ত্ব বিষয়ে

আলবের্ট আইনস্টাইন আলোচনা করিতেছিলেন—
(কী বলিতে হইবে, তাহা আবিষ্কার করাকেই
তো বলে জ্ঞান)—আলোচনা করিতেছিলেন
পল ভালেরির সঙ্গে,
জিজ্ঞাসা শুনিলেন :

হের আইনস্টাইন, আচ্ছা, আপনি আপনার
চিন্তাদের লইয়া কী করেন ? মাথায় গজাইবামাত্র
লিখিয়া ফ্যালেন ? নাকি সন্ধ্যাবেলা অব্দি
অপেক্ষা করেন ? কিংবা সকাল অব্দি ?

আলবের্ট আইনস্টাইন উত্তর দিলেন :
মঁসিয় ভালেরি, আমাদের ব্যবসায়ে
চিন্তারা এতই দুর্লভ
যে যখন কারু মগজে কোনো চিন্তা উদয় হয়
আপনি কিছুতেই তাহাকে ভুলিতে পারিবেন না।

এমনকী একবছর পরেও না।

বেদনা এই কথাটি বিষয়ে

ভিট্‌গেনস্টাইন বলেন যে 'বেদনা পাই' এই কথাটি
ক্রন্দন আর বিলাপের স্থান জবরদখল করিয়াছে। 'বেদনা' এই কথাটি
বেদনার অভিব্যক্তিকে প্রকাশ করে না, বরং তাহার স্থান দখল করিয়া বসে
জবরদখল করে এবং স্থানচ্যুত করে।
তদ্দ্বারা বেদনার বেলায় সে এক নূতন ব্যবহাররীতি সৃষ্টি করে।

বেদনা এবং আমাদের মধ্যে শব্দটি উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসে
স্তব্ধতার কোনো আচ্ছাদনের মতো।
ইহা স্তব্ধ করিয়া দেওয়াই। ইহা সেই ছুঁচ

যে রক্ত আর পৃথিবীর সংযোগসাধক
শেলাই খুলিয়া দেয়।

শব্দটি হইল মুক্তির
প্রথম পদক্ষেপ
কারু নিজের কাছ হইতে মুক্তির :

যদি দৈবাৎ অন্তরা
আশেপাশে থাকে।

শৈশব বিষয়ে

শৈশবের নীলকান্তমণিবৎ আশমানি প্রান্তরগুলিতে
শৈশব ব্যতীত আর কিছুই নাই।

ক্রমহরিদ্রাভ আকাশেও কিছু নাই, শূন্য মরিচা-পড়া
দেয়ালের গায়েও কিছু নাই, জং-ধরা দেয়ালের ওপাশেও কিছু নাই,
পূর্বদিগন্তেও কিছু নাই, পূর্বদিগন্তের ওপারেও কিছু নাই,
কিছুই নাই ছোটো ঘরটিতে, কিছুই নাই চাঁদমারিটিতে, কিছুই নাই
আয়নায়, কিংবা আয়নাটির ওপাশে।

শুধু শৈশব ব্যতীত।

বস্তুগুলা কেমন আশ্চর্য আর অচেনা কেননা তাহারা ছিল
একদিন এবং আবারও থাকিবে। অন্তত আমার যতদূর মনে পড়ে
শৈশব হইল
বস্তু আর জীবের মহাসম্মিলনের মাঝখানে নিঃসঙ্গ থাকা
যাহাদের কোনো নামও নাই বা কোনো গন্তব্যও নাই।

নাম বা গন্তব্যের কথা আমাদের মনে পড়ে পরে। পরে আমরা ধরিয়া নিই
যে কোনো দেয়াল কোনোকিছু হইতে কোনোকিছুকে বিচ্ছিন্ন করে,
যে কোনো বাড়িঘর আশ্রয় দেয় দুঃসময়ের বিরুদ্ধে,
যে কোনো কোকিল আমাদের ভালো লাগায় গানে আর রূপকথায়।
আমরা তাহা বিশ্বাস করি। তবে ব্যাপারটা হয়তো ঠিক ঐরকম নয়।

কারণ কোনো বাড়ির শূন্যতা অপরিসীম, কোকিলদের
উগ্রতা অপরিসীম এবং কোনো দুয়ার হইতে অন্য দুয়ারে
যাইবার রাস্তার কোনো শেষ নাই।

আর খুঁজিয়া-খুঁজিয়া আমরা হারাইয়া ফেলি, পাইয়া আমরা লুকাইয়া ফেলি।

কারণ বস্তুত আমরা খুঁজিতে থাকি আমাদের শৈশবকেই।

এক বুড়ি আর তার গাড়ি বিষয়ে

ধরা যাউক এক আছে বুড়ি আর আছে এক ঠেলাগাড়ি।
অতএব সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি বুড়ি বু আর ঠেলাগাড়ি ঠে।

প্রক্রিয়াটি সরিয়া গেল চৌকাঠ চৌ হইতে মোড় মো পর্যন্ত,
মোড় মো হইতে শিলাখণ্ড শি পর্যন্ত, শিলাখণ্ড শি হইতে
জঙ্গল জ পর্যন্ত, জঙ্গল জ হইতে দিগন্ত দি পর্যন্ত।

দিগন্ত দি হইল সেই জায়গা যেখানে দৃষ্টির সমাপ্তি
আর স্মৃতির সূচনা।

তৎসত্ত্বেও প্রক্রিয়াটি চলিতে থাকে
এক অপরিবর্তনীয় বেগমাত্রা বে-তে,
এক অপরিবর্তনীয় পথে,
কোনো অপরিবর্তনীয় বিশ্বে এবং
কোনো অপরিবর্তনীয় ভাগ্য লইয়া,
তাহার প্রেরণা এবং সারার্থকে নিজে-নিজেই বারংবার
সৃষ্টি করিয়া।

ইহা একটি অপেক্ষাকৃত স্বাধীন প্রক্রিয়া,
ভূদৃশ্যটি জুড়িয়া দিগন্ত হইতে দিগন্তে
সবসময়েই এক বুড়ি আর তাহার ঠেলাগাড়ি।

আর এইভাবেই চিরকালের জন্য সৃষ্টি হয়
ঐ পৃথিবীজোড়া একক,
ঐ ওখানে-যাওয়ার আর ফিরিয়া আসিবার একক,
হেমন্তের একক,
আমাদের প্রাত্যহিক রুটির একক,
হাওয়া আর নিচু আকাশের একক,
দূরের বাসাটির একক,
আমবা যখন যেভাবে ক্ষমা করিয়া দিই তাহার একক,
প্রদোষবেলার একক,
পদচিহ্ন ও ধুলার একক,
জীবনের পূর্ণতাব একক তথাস্তু।

জ্যাক বিষয়ে

উপরে-কথিত ব্যক্তি, সকলেই তো জানেন,
গরিব বটে তবে তাহার জন্ম স্বাস্থ্যসম্মত,
বিশাল জগতের
ন-টি পাহাড আর ন টি নদীর উপর দিয়া তাহার পথ করিয়া লইয়াছিল।

সেখানে,
সে পুরাণগুলির শিকার লইয়া পডিল। বাস্তবে কিন্তু,
বলাই বাহুল্য, আমরা সবাই জানি, তাহার সহিত দেখা হইয়াছিল
কালো অরণ্যে এক শুভ্রকেশ পিতামহের এবং উভয়ের মধ্যে
কিছু বাক্যবিনিময় হইয়াছিল।

অবশ্য,
সে তাহাকে কিছুই দিতে পারে নাই কেননা বামনেরা
ইতোমধ্যে তাহার পিঠাগুলা লইয়া চম্পট দিয়াছিল।
সে পৌছিয়াছিল শোকবিহ্বল নগরীতে, কিন্তু
শুঁড়িখানায় সে কোনো খবর সংগ্রহ করিতে পারে নাই
কেননা

শুঁড়িখানাগুলা রাজকীয় অনুজ্ঞায় নিষিদ্ধ হইয়া গিয়াছিল
এবং বিদেশীদের প্রভৃত নির্যাতনের মধ্যে জিজ্ঞাসাবাদের পর
ক্ষিপ্রবেগে ড্র্যাগন-পর্বতে লইয়া যাওয়া হইতেছিল।

এইভাবেই তাহার সহিত এক ড্র্যাগনের দেখা হইয়াছিল যে তৎক্ষণাৎ
তাহাকে আচ্ছা ধোলাই দিয়া আপাদমস্তক বাঁধিয়া রাখিয়াছিল
যাহাতে পথিক নাইটদের সে
লোভ দেখাইয়া নিজের খর্পরে আনিতে পারে।

অর্ধেক রাজত্ব সমেত এক রাজকন্যা তাহাকে উদ্ভাবন করিতে হইয়াছিল
যখন য-পলায়তি-দৌড়ের সময় সে
বন্দুকবাজদের তাগে পড়িয়াছিল এবং তাহাকে কৈফিয়ৎ দিতে হইয়াছিল
কোথায় সে তাহার সময় আহ্লাদে ব্যয় করিয়াছে।

আর এইভাবেই সে ফিরিয়া আসিয়াছিল বাড়ি, পরিধেয় ছিন্ন, রোগা টিংটিঙে,
সব বিভ্রম অপসৃত। পারিবারিক খড়ের গাদায়
ধপ করিয়া বসিয়া পড়িয়া সে ভাবিতে লাগিল। আর অকস্মাৎ
সে অনুধাবন করিয়া বসিল যে
সে পাখিটাখি কীটপতঙ্গের ভাষা বুঝিতে পারে।

এবং সে পূর্ণ বোধগম্যতার সহিত তাহাদের শ্রবণ করিল।

এবং কশাই পাখিদের কাছ হইতে সে সত্যি
কতগুলা চমৎকার রূপকথা শিখিয়া লইল।

সূর্য বিষয়ে

আবহাওয়াবিশারদদের সুপরিকল্পিত ক্রিয়াকলাপ
এবং সংগ্রামী শ্রমিক শ্রেণীর সাধারণ সাফল্যের সৌজন্যে
আমরা সকলেই তো বিস্তর অয়ন-অয়নান্ত দেখিয়াছি ;
বিস্তর গ্রহণ এবং এমনকী
সূর্যোদয়ও।

কিন্তু আমরা তো কোনোদিন সূর্যকে দেখি নাই !

অর্থাৎ : আমরা সূর্যকে দেখিয়াছি
গাছপালার মধ্যে, তাত্রা জাতীয়বিতানের উপরে,
দেখিয়াছি অনতিক্রম্য রাজপথের ওপারে,
দেখিয়াছি আলোয়য় ভাসমান লিপ্‌নিৎসে
যেখানে কি না ইয়ারোস্লাভ হাশেকের জন্ম হইয়াছিল,
কিন্তু কখনও সূর্যকে দেখি নাই,
সেই শুধু-কেবল আর-কিছুই-নয় সূর্যকে।

শুধু-কেবল আর-কিছুই-নয় সূর্য মহাশয় অসহ্য।
কেবলমাত্র সেই সূর্য
গাছপালা, ছায়া, পাহাড়, লিপ্‌নিৎসে, ট্র্যাফিক পুলিশ
ইত্যাদির সহিত যাহার সম্পর্ক
সেই সূর্যই জনগণের।

শুধু-কেবল আর-কিছুই-নয় সূর্য মহাশয় এক প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাতের ন্যায়
উপস্থিত থাকেন সমুদ্রের উপর, মরুভূমির উপর
অথবা কোনো বিমানের উপর,
তিনি কোনো ছায়া বানান না আর দল বাঁধিয়া ঝলশানও না,
তিনি এমনই একমাত্র এবং অদ্বিতীয় যে
আছেন কি না সেটাই বোঝা দায়।

সত্যের বেলাতেও ব্যাপারটা ঠিক এইরকমই।

গার্‌গয়েল বিষয়ে

সাধারণ শিলীভবন প্রক্রিয়া চলাকালীন
দ্বিরাণু হইতে গজাইয়া ওঠে শৈলশ্রেণী, দীর্ঘশ্বাস হইতে নগরসমূহ
এবং প্রশ্নচিহ্ন হইতে অনুজ্ঞা।

সাধারণ শিলীভবন প্রক্রিয়া চলিতে থাকার সময় যে-সব দেবদূত
মান্‌সাড খিলান, কার্নিশের আড়াল এবং
উঁচু গোলন্দাজ মিনারে থাকিত, ক্রমে শক্ত হইতে-হইতে
একেবারে ছ্যাতাপড়া অতিক্ষিপ্ত গন্ধকদানবে পরিণত হইয়া যায়,
টান-টান নখরে আঁকড়াইয়া ধরে সরু কিনার
আর রূপান্তরিত হয় গার্‌গয়েলে।
এমতাবস্থায়,
প্রচণ্ড চীৎকার করিয়া
তাহারা পথচারীদের তাগ করিয়া মুখ ছুটায় :

এই হুতুম, অমন ড্যাবড্যাব তাকাইয়া আছিস কিসের দিকে রে ?
ধুলা
তুই, ধুলাতেই তো তুই ফিরিয়া যাইবি,
অথবা
কাটিয়া পড়ো তো বাছাধন, মাধ্যাকর্ষণের গায়েই লাগিয়া থাকো।

বৃষ্টি যখন পড়ে তাহারা তাহাদের ঘৃণাকে প্রবল তোড়ে উচ্ছ্রিত করিয়া তোলে,
উল্লাসে আর ঘেন্নায় শিহরিত হইয়া ওঠে,
রাত্রিকালে মাটি চাটে মণ্ডবৎ জিহ্বায়,
কালোকে শাদা করিয়া তোলে
এবং বিপরীতটাও।

এই অবস্থায়, বসন্তকালে মাঝে-মাঝে তাহারা লজ্জাবোধ করে,
অধোবদনে নামিয়া আসে নিচে ; আর কালো বিড়াল
এবং চন্দ্রাহত মার্‌মটদের সদৃশতায়
খিটখিটেভাবে যাবতীয় পথিকেরই সমালোচনা করে
এবং তাহাদের মধ্যে বিশেষভাবে গার্‌গয়েলদের।
অতঃপর দপ্তরবিহীন কৌতূহলী দেবদূতেরা
তাহাদের শিখর হইতে নামিয়া আসে নিচে
আর তাহাদের টানটান নখরযুক্ত থাবায়
আলিশার সরু কিনারাটায় ধরা পড়িয়া গিয়া, কান খাড়া করিয়া শোনে।

আর এইভাবেই তাহারা কঠিন হইয়া পড়ে,
হইয়া ওঠে গন্ধকনির্মিত এবং শিলীভূত।

অন্তত এইভাবেই নিশ্চিত হওয়া যায়
গার্‌গয়েলদের স্থায়ী রূপান্তর সম্বন্ধে,
গথিক চেহারাছিরির পরিবর্তনহীনতা সম্বন্ধে,
আর মাধ্যাকর্ষণের জন্য
পথচারী, বিড়াল ও মার্‌মটদের সম্ভ্রম সম্বন্ধে।

চোখ বিষয়ে

দেবীরা, দেবতারা, আতঙ্ক আর স্পর্ধা — তাহাদের চোখ খুব ডাগর।
কোনো-কোনো দেবতার চোখ এতই বিশাল হয় যে
অন্যকোনোকিছুর কোনো স্থানই আর থাকে না, সেক্ষেত্রে
দেবতাটি মানেই চোখ।

তাহার পরে আছে শুধুমাত্র চক্ষু যে সবই দ্যাখে, সবই জানে,
উপহার দেয়, এমন-কিছু, যাহা চক্ষুটি ছাড়াই থাকিতে পারিত,
তবে চক্ষুটি থাকিলে অবশ্য আরো-ভালো।

সাইক্লোপ, ওল্‌ম, খোচর এবং সংবর্তের দেবদূতেরা —
তাহাদের চক্ষু কিন্তু অতি ক্ষুদ্র। তবে সংখ্যায় বিস্তর।
প্রতিটি চাবির ফোকরে একটি করিয়া খুদে চোখ।
কোনো-কোনো দেবদূত এবং অন্য কেউ-কেউ যাহারা ঐ পদেই বিরাজমান,
ইহা দ্বারা আমরা অবশ্য ওল্‌মদের বুঝাইতেছি না,
তাহাদের এতগুলা খুদে-খুদে চোখ আছে যে
মনুষ্যের ক্ষুদ্র ভগ্নাংশেরও আর কোনো জায়গা থাকে না।
কিছু গোপন করিবার আশায় এইসব চক্ষু থাকে বিনত।

চক্ষুর পিছনে আছে নেত্রের বিস্তার আর পশ্চাৎ-কপালের লতি,
অক্ষিপটের বিশেষ-বিশেষ ক্ষেত্রের সহিতই
তাহাদের বিশেষ-বিশেষ ক্ষেত্রের সুসমঞ্জ যোগাযোগ।
অতীব ডাগর চক্ষুর আড়ালে কিছুই নাই।
অতি খুদে চোখগুলির আড়ালে আছে প্রলয়কাল।

বেড়া বিষয়ে

কোনো বেড়া
সে শুরু হয় কোথাও-না,
শেষ হয় কোথাও-না,
এবং
যেখানে সে নাই সেখান হইতে
যেখানে সে আছে সেই স্থানটিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখে।

দুর্ভাগ্যবশত
প্রতিটি বেড়াই অল্পবিস্তর
সুভেদ্য, কোনোটা ছেলেছোকরাদের দ্বারা,
কোনোটা প্রাপ্তবয়স্কদের দ্বারা, যাহাতে
কোনো বেড়া বস্তুত
বিচ্ছিন্ন করে না, বরং বুঝাইয়া দেয় যে
অন্তত একটা-কিছুর বিচ্ছিন্ন হওয়া উচিত।
এবং বেড়া টপকানো দণ্ডনীয়।

এই অর্থে
অনায়াসেই কেউ কোনো বেড়ার
বদলে
বসাইতে পারে কোনো খারাপ কথা, কখনও এমনকী
ভালো কথাও, তবে তাহা কিন্তু
বেশির ভাগ সময়ই কারু মাথায় খেলে না।

এই অর্থে অতএব
কোনো নিখুঁত বেড়া হইল
তাহাই যে
কিছুই-নাকে কিছুই-না হইতে বিচ্ছিন্ন করে,

যেখানে কিছুই নাই এমন জায়গা হইতে
সেই না-জায়গাকে বিচ্ছিন্ন করে যেখানে কিছু আছে।

উহাই হইল চরম বেড়া,
ঠিক কোনো কবির কথার মতোই।

বড়োদিনের রোহিতনিধন বিষয়ে

হাতে নেয় দারুনির্মিত হাতুড়ি
আর ছুরি
এবং ঠিক জায়গাটিতেই কোপ বসায়
যাহাতে সে আর বেশি ঝাপট না-মারে, কেননা
ঝাপটগুলি বড্ড বেশি জটিলতা সৃষ্টি করে আর মুনাফাও হ্রাস পায়।
আর নিছক দর্শকেরা তির্যকভাবে তাকায়, দক্ষতার প্রশংসা করে
আর তাহাদের টাকার থলির উদ্দেশে হাত বাড়ায়। আর মোড়ক বাঁধিবার
কাগজ তো প্রস্তুত। আর চিমনিগুলা তো ধোঁয়া উগরাইতেছে।
আর জানালা দিয়া উঁকি মারে বড়োদিন, জমিকে আলিঙ্গন করে
আর পিপাসাগুলির মধ্যে ফেনা ছিটায়।

ইহাই হর্ষ ও উল্লাসের বিধি।

শুধু আমার চমক লাগে রোহিত মৎস্য ইহার উপযুক্ত প্রাণী কি না
এই কথা ভাবিয়া।
অনেক ভালো হইত বরং, যদি এমন-কিছু থাকিত
যে, যখন তাহাকে তোলা হইল, মাটিতে চিৎপাত রাখা হইল,
জোরে চাপিয়া ধরা হইল,
যে তাহার নীল চোখ বিন্যস্ত করিবে
দারু-হাতুড়িতে, ছুরিকায়, টাকার থলিতে, মোড়ক বাঁধিবার কাগজে,
নিছক দর্শকদের উপর, ধূমায়িত চিমনিগুলায়
আর যিশুর জন্মোৎসবে।

এবং তাহার পরও কোনোমতে
কিছু বলিতে পারিবে। যেমন

আহা, ইহা আমার জীবনের সেরা মুহূর্ত ; আমার স্বর্ণ দিবস।
কিংবা
আমার উপরে তারকাখচিত আকাশ আর আমার মধ্যে নৈতিক সংহিতা।
কিংবা
আরে ইহা যে নড়িতেছে !

অথবা অন্তত
হাল্লেলুইয়া !

হাস্য বিষয়ক

যখন হাসিয়া উঠি আমরা এ-কান হইতে ও-কান পর্যন্ত মুখ ব্যাদান করি,
অথবা ঐরূপ কোনো চেষ্টা করি,
এবং দন্তবিকাশ করি, উহার দ্বারা বুঝাই
বিকাশের সেই বিগত স্তরগুলাকে
যখন হাস্য অভিব্যক্ত করিত
নিপাতিত যমজ ভ্রাতার উপর বিজয়বার্তা।
আমরা গভীরভাবে কণ্ঠনালী হইতে শ্বাসত্যাগ করি,
যখন যে-মতো প্রয়োজন, কোমলভাবে স্পন্দিত করি
স্বরশিরাগুলি, কিংবা কপালে হাত দিই
অথবা ঘাড়ে, নয়তো হাত কচলাই আর
উরু চাপড়াই, ইহাই প্রকাশ করিতে যে বিগত স্তরগুলার,
বিজয় আরো বুঝাইত

ক্ষিপ্রপদ।
সাধারণভাবে বলিতে গেলে আমরা তখনই হাসি যখন হাসিবার ইচ্ছা হয়।

তবে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে আমরা হাসিয়া উঠি
হাসিবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা না-থাকা সত্ত্বেও,

আমরা হাসি কেননা হাসিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে, অথবা
আমরা হাসিয়া উঠি যখন তাহা পুরাপুরি নিষিদ্ধ।

আর সত্যি-বলিতে, হাসিয়া পেটে খিল ধরাই আমরা
হাসিয়া মুণ্ডুটা উড়াইয়া দিই
যাতে আমাদের শুনিতে না-হয় কোথায় কেমনভাবে
কে-একজন সবসময় আমাদের দেখিয়া হাসিতেছে।

প্লাবন বিষয়ে

আমাদের এই কথা বিশ্বাস করাইয়াই বড়ো করা হইয়াছিল যে
কোনো বন্যা শুধু তখনই হয়
যখন জল সব সীমা ছাপাইয়া ওঠে,
ঢাকিয়া ফ্যালে বনপ্রান্তর, টিলাপাহাড়,
ক্ষণস্থায়ী বা চিরস্থায়ী বাসস্থান।
যাহাতে
যাবতীয় নারী, পুরুষ, মাননীয় শুভ্রশ্মশ্রু,
বাচ্চা আর কোলের শিশু, বনপ্রান্তরের জানোয়ার,
স্নমেরুর মূষিক আর লেপ্রেশন
সেই শেষ শিলাখণ্ডগুলির উপর জড়াজড়ি করিয়া থাকে
যেগুলি ধীরে-ধীরে ইস্পাত-জলে ডুবিয়া যাইতেছে।
আর যদি কেবল কোনো ধরনের বজরা থাকিত…আর যদি কেবল
কোনো ধরনের আরারাট…কে জানে?
বন্যা-বিষয়ক প্রতিবেদনগুলি কেমন অদ্ভুত
বৈচিত্র্যময়। ইতিহাস বস্তুত সেই বিজ্ঞান
যাহা দুর্বল স্মরণশক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

এইপ্রকার বন্যাগুলিকে অবশ্য তেমন পাত্তা দেওয়া উচিত নয়।

কোনো সত্যিকার বন্যা?
তা গোক্ষুররচিত গর্তের জলের মতো।

সমীপবর্তী কোনো জলার মতো।
কোনো ভেজা চৌবাচ্চার মতো।
স্তব্ধতার মতো।
কিছুই-না-এর মতো।

কোনো সত্যিকার বন্যা আসে তখন যখন বুড়বুড়ি তুলিয়া
ফেনা ছোটে আমাদের মুখ হইতে
আর আমরা তাহাদিগকে ভাবিয়া লই
কথার তোড়।

ফাটল বিষয়ে

প্রতি মুহূর্তেই কিছু-না-কিছু ফাটিতেছে কারণ
সবকিছুই একদিন-না-একদিন ফাটিয়া যায়, কোনো ডিম,
কোনো বর্ম, কোনো পুথির মেরুদণ্ড।

মানুষের মেরুদণ্ড হয়তো তাহার
একমাত্র ব্যতিক্রম, যদিও
অনেক কিছুই নির্ভর করে স্থান, কাল ও চাপের পরিমাণের উপর।
সেইসব দৃষ্টান্ত তাই একান্তই দুর্লভ।
প্রায় নাই-ই। কেননা
আশেপাশে রহিয়াছে কত-যে সব
স্থান, কাল ও চাপ।
ফাটলগুলি সচরাচর গায়ে-গায়ে লাগিয়া থাকে।
অন্তত ইহা কোনো নথিতে নাই
যে কেহ সাধ করিয়া ফাটিয়া যাইতে চাহে,
এমনকী চাবুকচিড়ন্দাজেরাও নহে।

ফাটল জোড়া যায় মোম বা প্যারাফিন দ্বারা,
ঝালাই করিলে, পট্টি বাঁধিলে। অথবা উক্তি দিয়াই অস্তিত্ব হইতে উড়াইয়া
দেওয়া হয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ইহাই হয়।

কিন্তু জোড়া-লাগানো ডিম কি আর ডিম থাকে!
কোনো তাপ্পি-লাগানো বর্ম তো আর বর্ম নহে,
যতই ডাক্তারি পট্টি বাঁধা হৌক
পট্টিবাঁধা গোড়ালি হইল আকিলিস গোড়ালি, আর
কথায় যাহাকে উড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে সেই মানব তো
আর সে নাই একদিন যাহা সে ছিল,
বরং সে হইয়া ওঠে অন্যসকলেরই আঁকিলিস গোড়ালি।

সব-চাইতে বিশ্রী হয় যখন শত-শত জোড়ালাগানো ডিম
নিজেদের সেরা ডিম বলিয়া চালাইয়া দেয় আর শত-শত
ঝালাই-করা বর্ম বাজার মাৎ করে যথার্থ বর্ম হিশাবে,
আর শত-সহস্র ফাটা-চেরা লোক নিজেদের চালাইয়া দেয়
একশিলা বলিয়া।

তখনই দেখা দেয় একটি প্রকাণ্ড ফাটল।

এই ফাট-ধরা জগতে আমরা শুধু এইটুকুই করিতে পারি
যে মাঝে-মাঝে চ্যাচাইয়া উঠিতে পারি, শ্রীযুক্ত নির্দেশক,
সিঁড়ির উপর সাবধানে পা ফেলিবেন,
একটি ফাটল আছে আপনার,
যদি অনুমতি দেন তো বলি।

এই মাত্রই। তাহার পর তো শুধু আরো-অনেক ফাট-ফাট-ফটাশ।

পরীক্ষানল বিষয়ে

নাও
একটুখানি আগুন, কিঞ্চিৎ জল,
খরগোশ বা গাছের যৎসামান্য,
কিংবা মানুষের যে-কোনো খুদে টুকরা,

তারপর ঘাঁটো সবকিছু, মেশাও, ভালো করিয়া ঝাঁকাও,
ছিপি ঠুশিয়া আটকাও,
রাখো তাহাকে কোনো উষ্ণ স্থানে, অন্ধকারে, আলোয়, তুহিনের মধ্যে,
কিছুক্ষণ ঐভাবেই থাকিতে দাও তাহাকে—যদিও তোমাকে কিন্তু
কেহই ছাড়িয়া দেয় না—
আর ইহাই হইল মূল কথা।

আর তারপর
তাকাইয়া দ্যাখো একবার—আর সে বাড়িতে থাকে,
কোনো খুদে সমুদ্র, কোনো একরত্তি অগ্নেয়গিরি,
কোনো ছোট্ট গাছ, ক্ষুদ্র-এক হৃদয়, ক্ষুদ্র-কোনো মগজ,
এতই ছোটো যে তুমি শুনিতেই পাও না
তাহাকে ছাড়িয়া দিবার জন্য তাহার সে কী ব্যাকুল অনুনয়,
আর ইহাই হইল মূল কথা, এই না-শোনা।

তাহার পর তুমি গিয়া
তাহা নথিবদ্ধ করো, সব দোষ বা
সব গুণ, কোনোটার পাশে বিস্ময়চিহ্ন,
নথিবদ্ধ করো সমস্ত শূন্য অথবা সমস্ত সংখ্যা, কারু পাশে-বা বিস্ময়চিহ্ন।
আর আসল কথা হইল যে কোনো পরীক্ষানল হইল
প্রশ্নকে বিস্ময়চিহ্নে রূপান্তরিত করিবার এক যন্ত্র।

আর মূল কথা হইল ইহাই
কিছুক্ষণের জন্য তুমি ভুলিয়া যাও যে
তুমি নিজেই আছো
পরীক্ষানলটির ভিতরে।

আলোক বিষয়ে

আমরা আলো বানাই দেখিব বলিয়া।

সিলুরিয়ান যুগে তাহারা আলো বানাইয়াছিল যাহাতে তাহারা
সিলুরিয়ান শিলাগুলি দেখিতে পারে।
পাললিক যুগে তাহারা আলো বানাইয়াছিল যাহাতে তাহারা
প্লাবন দেখিতে পারে।
ট্রয় নগরীতে তাহারা আলো বানাইয়াছিল যাহাতে তাহারা
ট্রয়কে দেখিতে পায়।
সেই সময়ে তাহারা দেখিয়াছিল গ্রীকদের যাহারা আশেপাশেই ছিল।
আলোকপ্রাপ্তির যুগে তাহারা আলো বানাইয়াছিল যাহাতে তাহারা
আলোকপ্রাপ্তি দেখিতে পারে।
আর এইভাবেই আছে বিষয়টা আজও।
বস্তুত কতিপয় প্রজাতিই তো এই উদ্দেশ্যে গজাইয়াছে, যেমন জোনাকি,
আর কিছু-কিছু প্রত্যাদিষ্ট পেশাও, যেমন মশালধারী।
বহু ধরনের শক্তিই আলোকে রূপান্তরিত হয়,
বৈদ্যুতিক, রাসায়নিক, বলবিদ্যক, জীববিদ্যক।
এমনকী মাঝে-মাঝে ব্যাটারিও মেলে।
এতই আলো হইয়াছে যে আমরা মোড়ের মাথা অব্দি দেখিতে পারি,
জঠরের ভিতরটা পর্যন্ত দেখিতে পারি,
রাত্রির শিকড়গুলিশুদ্ধ দেখিতে পারি।

দেখাটা
হয়তো ততটা উপভোগ্য নাও হইতে পারে।
কিন্তু ইহাই দেখা জরুরি যে
আমরা আলো বানাইতে পারি,
আলো,
আলো,
আলো,
যতক্ষণ-না চোখ ধাঁধাইয়া আমরা অন্ধ হইয়া যাই।

অর্থ বিষয়ে

গোল ইহাই যে সবছুিরই বাস্তবিক
কিছু-না-কিছু নিজস্ব অর্থ আছে। যাহাই আপনি ভাবুন-না কেন,
যাহাই আপনার মুণ্ডদেশে পড়ুক না কেন।
অর্থটি সবসময়েই যোগ করা আছে। মাথার ভিতরেই
হৌক অথবা মাথার উপরেই হৌক,

একটা বেলনের অর্থ আছে, আর-কিছু না-হইলেও
অন্তত এটা যে সে ঘনক্ষেত্র নহে। কোনো ফাটলেরও অর্থ হয়।
অন্তত এটা যে সে কোনো হাগুড়া পাহাড়পর্বত নহে।
যে-সব বেলন ঘনক্ষেত্র বলিয়া ভান করে অথবা যে-সব ফাটল
ভান করে তাহারা যেন পাহাড়পর্বত,
তাহাদের গায়ে আঁটিয়া যায় কোনো বিশেষ অর্থ।
এই প্রকার বস্তুগুলির বিশেষ অর্থ এটাই যে
তাহারা অন্যদের তাহাদের নিজস্ব অর্থ হইতে বঞ্চিত করে।

এই চিন্তাটি কিন্তু আদৌ নির্বস্তুক নহে।

ইতিহাস পড়িতে-পড়িতেই আমার মাথায়
ইহা খেলিয়া গিয়াছিল।

ব্যঞ্জনবর্ণ ম বিষয়ে অতীব ক্ষুদ্র চিন্তা

ক	খ	গ	ঘ	ঙ
চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
ট	ঠ	ড	ঢ	ণ
ত	থ	দ	ধ	ন
প	ফ	ব	ভ	য
র	ল	ব	হ	শ
ষ	স	ং	ঃ	ঁ

কারকীউৎস

পাথরের উৎস বিষয়ে

ওপরচলতি এস্‌কালেটরে ক'রে নিচে
নামার সময় সে পেছিয়ে পড়েছিলো,
কাঁধে তার গ্রহখানি,
তার এই বেহেড অধঃপতনে নিশ্চল,
কোনো অঘোষিত যুদ্ধের সময়কার প'ড়ে-থাকা একটা মাইন-এর মতো,
কোনো লুপ্ত রাক্ষসের বিষ্ঠার মতো অগোচর,
অনধিগম্য এমনকী সিসিফাসের কাছেও।

কখনো-কখনো কেউ-কেউ তাকে পোষে বুকের মধ্যে,
কখনো-বা সে বিঁধে যায় কারু গলায়,
কখনো সে প'ড়ে থাকে রাস্তায় চিৎপাত,

যতদিন-না শেষ পথিকটি
হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে তাকে কুড়িয়ে নেয়
আর ছুঁড়ে মারে কাউকে তাগ ক'রে।

এইভাবেই সে দেখা দেয় আমাদের কালে,
নিজেকে সে বলে পাথর
আর এটা বোঝে সবকিছুরই
কোনো-না-কোনো লক্ষ্য আছে।

মেঘেদের উৎস বিষয়ে

মাটিপৃথিবীর এই তরল কীটাণুকীটতা :
কেউ-একজন গুঁড়ি মেরে আসছে পেছনে,
কেউ-একজন ওঁৎ পেতে আছে মোড়ের মাথায়,
কেউ-একজন নজর রাখছে নর্দমা থেকে,

কেউ-একজন আড়ি পাতছে দেয়ালের আড়ালে।
কেউ-একজন ছড়িয়ে যাচ্ছে রক্তের প্রবাহে।

বোবা আকাশের দিকে তাকিয়ে-থাকা ছাড়া
কিছুই আর করার নেই
পাতাল থেকে ওপরে প'ড়ে-যাওয়া ছাড়া।

কিন্তু আকাশ তো নীলের মুখোশ-পরা
একটা প্রকাণ্ড আতশ কাচ,
তার চোখ বসানো ত্রিভুজে
আব তুলোয়-ডোবানো ভিডিও ফিতেয় ধ'রে-রাখা

আস্ত যন্ত্রটাই পুরোপুরি স্বয়ংচল
আর একান্তই গোপনীয়।

শুধু এটাই আশা করা যায় যে
মেঘেদের এখনও অস্তিত্ব আছে
যেমন ছিলো সেই প্রাথমিক যুগে
যখন উদ্ভাবন ক'বে নিতে হয়েছিলো অনচ্ছতা।

ফুটবলের উৎস বিষয়ে

কংক্রিটের গায়ে বসানো এক নুড়ি
যেন কেন্নোদের প্রতিভার এক পাথরমূর্তি ,
আর সে কিছুতেই নড়ে না।

ইতিহাসের ধারাবাহিকতার এক শিলালিপি,
যেখানে কোনোকালেই কিছু ঘটেনি
সেখানে বেশ ছোটো-একটা
বিজয়তোরণ :
আর, সে আদপেই নড়ে না।

এক শ্লেষ্মাবিজড়িত বাতে-কুঁকড়োনো থাম
যার গা থেকে বিজ্ঞপ্তি চুরি-করা নিষিদ্ধ এই বিজ্ঞপ্তিটাই
তারা চুরি ক'রে নিয়েছে :
আর, সে আদৌ নড়ে না।

জ্যান্ত কাঁটাতার
পাহারা দিচ্ছে
পুঁজেভরা ক্ষতবিক্ষত পায়ের স্বপ্নগুলো :
আর সে মোটেই নড়ে না।

আর, তাই, যখন দৈবাৎ কেউ
কোনোকিছুকে গড়িয়ে যেতে ছাখে,
তড়াক ক'রে লাথি কষিয়ে দেয়।

আর অমনি দুলে ওঠে মহাকাশ,
তুবড়ে যায় মন্দিরের গুণ্ঠন,
আর হাজার-হাজার লোকের অশ্লীল হা খুলে যায়
স্তব্ধতার এক দমআটকানো বিস্ফোরণে।

যেন লুপ্ত-সব প্রাগৈতিহাসিক কাঁকড়ারা
চেঁচিয়ে উঠছে গো-ও-ল।

কোনো বাক্সর উৎস বিষয়ে

তার শূন্য হাত ছুটি
আর শূন্য মাথা,
আর তার শূন্য ডেস্কের ওপর এক তা শাদা কাগজ সম্বন্ধে
অবহিত হ'য়ে

সে তুলে নিলে কাগজটি, দু-ভাঁজ করলে তাকে কয়েকবার,
কাটলো, ভাঁজ করলো, আঠা দিয়ে শাঁটলো, জুড়ে দিলো

সেই শাদা আধার জমিটি,
উচ্চতা × প্রসারতা × গভীরতা,

আর, ব্যাস তৈরি হ'য়ে গেলো ব্যাপারটা : কোকিলের বাসা,
আণুবীক্ষণিক আশাআকাঙ্ক্ষার
খুদে একটা খুপরি।

আর তারপর সে তাকে ভুলে গেলো
কোথাকার কোন্ তাকের ওপর।

আব এখন সে সবসময় বলে—

—আরে, কোথাও নিশ্চযই তাকে তুলে রেখেছি
কোনো ছোট্ট বাক্সে।
শুধু এক মিনিট সবুব করো—এক্ষুনি খুঁজে বাব ক'বে দিচ্ছি।

চিন্তা

না-ভেবেচিন্তেই তুমি হাত ধোও তোমার, মোছো
তাদের কোনো শাদা বা নীল তোয়ালেতে,
ক্লান্ত মাথা ঠেশ দিযে রাখো টেবিলে,
বাঁ হাতে তুমি ধ'রে থাকো
কবোটির হাড,
আর ডান হাত দিয়ে তুমি বিলি কেটে যাও
ঠাণ্ডা-হ'তে-থাকা তন্তুতে।

আগে থেকেই যা আছে
কিংবা হয়তো ঘটছে এখন
তার হদিশ খোঁজো তুমি
কারণ তুমি তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখছো।

সে যাই হোক যা-ই তুমি পাকড়ে ধরো-না কেন
তুমি বার ক'রে আনো, মোছো তোমার ট্রাউজারে,
ফুঁ দিয়ে ওড়াও, ছুঁড়ে ফ্যালো পায়ের নিচে।

কিন্তু যা তুমি খুঁজে পাও না
তাকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াও তুমি।
এদিক থেকে চিন্তারা সবাই একেবারে
উকুনের মতো
হেরাক্লিটাস যেমন জানতেন।

ভিতরযাত্রা

ভাষার উৎসের খোঁজে বেরিয়ে মাঝপথে
তুমি এলোমেলো ঘুরে বেড়িয়েছিলে মধ্যরাতের পাড়াগাঁয়ে যেখানে
পাথর নয় তার বদলে খোলা পড়েছিলো চোখগুলো।
তারপর পথ গেলো গুঁড়িয়ে
ছোট্ট ঘোলাজলের ওপরকার বরফ যেমন গুঁড়িয়ে যায় পায়ের তলায়
আর তুমি প'ড়ে গেলে তার মধ্য দিয়ে। কয়েক হাজার বছর।

মাকড়শার জালে ছাওয়া জানলাবিহীন
একটা পরিত্যক্ত মাটির তলার ভাঁড়ারে তুমি
আবিষ্কার করলে নিজেকে। দেয়ালের পাশে ভয়ে শিঁটিয়েছিলো
দু-তিনটে ছেঁড়াখোঁড়া শব্দ
(আমি···দূরে-কোথাও···সবুজ)
আর গোঙাতে-গোঙাতে তারা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে গেলো
মেঝের ওপর।

ওপরে ওঠবার ঢাকাদরজা ঝনাৎ ক'রে আটকে দিয়ে তুমি পিঠটান দিলে।
ভেতরটা, তুমি বোঝালে নিজেকে,
হয়তো-বা ভেতরটাই বাহির।

কড়িকাঠের উৎস বিষয়ে

ওপর থেকে বৃষ্টি পড়ছিলো। মেঘেরা বাজ ডাকালো।
আগুন আর গন্ধক ঝরলো মুষলধারে। তাকিয়েছিলো
সে-এক ভেংচি-কাটা মুখ।
রাত্তিরে ছায়াপথগুলো ছড়িয়ে পড়লো
আর কুড়ি শত-কোটি বছর
পাকড়ে ধরলো ঘাড়
বিদ্যুৎবাহী-ধাতুনখের থাবায়।

ছিলো অসহনীয়,
প্রেমের সামান্য ক-টি মুহূর্ত ছাড়া।
আর মৃত্যুর। হয়তো-বা তা-ও।

তাই আমরা বসিয়ে দিই
কংক্রিটের সরদল, অপরিবহনের আস্তর
আর বিস্তর চুন দিয়ে লাগাই পলেস্তারা।

আর যখন আমরা শুয়ে থাকি পরস্পরের পাশাপাশি,
শুধু ওপর দিকে তাকিয়ে, আর তুমি জিগেশ করো,
—কী আছে ওখানে, ওপরে ?—
আমি তোমার কানের ওপর ঝুঁকে প'ড়ে গোপন কথাটি ফিশফিশ ক'রে দেবো-

দুটো ফাটল কাটাকুটি ক'রে চলেছে,
একটা বারোক দাগ—তিন-ঠেঙে এক হরিণের মতো
আর এক মাকড়শা তৈরি হ'য়ে নিচ্ছে আস্তে-ধীরে।

তুমি বরং ঝাড়পোঁছ কোরো
সকালবেলায়।

উদ্‌জানের মধ্যে অম্লজানজারিত পদার্থের প্রাদুর্ভাব বিষয়ে

মেঘদূতদের ঐকতান গায়কেরা
হ্যামবুর্গার ফিরিওলাদের সমস্বর গায়কে বদ্‌লে যায় দেখে,

বড়ো রাস্তার যানবাহনকেই যে রাস্তা ছেড়ে দিতে হয়
এই জেনে,

হাইওয়েগুলো দিয়ে যাতায়াত ক্রমেই যে অসম্ভব হ'য়ে উঠছে
আর মগজের মধ্যে ক্রমেই যে বেশি-বেশি জট পাকিয়ে যাচ্ছে—এই দেখে,

আফ্রোদিতের মর্মরস্তনও যে
ঝুলে পড়ছে, আর বুকের মধ্যে ঝরছে গুঁড়ি বৃষ্টি
আর জং ধ'রে যাচ্ছে গোড়ালিতে—
এই দেখে,

কেউ-না-কেউ সবসময়েই জিগেশ করছে
ক-টা বাজে, যদিও প্রলয় এখনও
এত দূরে,—
এটা লক্ষ ক'রে,

হতাশ হ'য়ে,

সে থাপ্পড় কষায় টেবিলে,
চুরমার ক'রে ফ্যালে ঠাকুমার ঘড়ি,
খরগোশদের জন্য বিপদসংকেত লাথি মেরে ভাঙে,
সোজাসুজি মাইক্রোফোনের মধ্যে
উন্মুক্ত ক'রে দেয় রক্তের ঢল,

পাখা গজিয়ে ফ্যালে, উড়াল দেয় আর আছাড় খেয়ে পড়ে;
দুই কষে ফেনা, কানের পাশে
চুলের ফেনা, দাড়ির ফেনা,

মাথার চারপাশে রামধনুর ফেনা,
ফেনার এক প্লাবন উপচে গড়িয়ে যায়
সবকিছুর ওপর দিয়ে, আপাতত, একটুক্ষণের জন্য।

এবারটায় আমরা সত্যি
ব্যাপারটাকে অম্লজানিত ক'রে ফেলেছি।

সে অবশ্য উঠে পড়বে সকালবেলায়, আর আগের মতোই চালিয়ে যাবে
ব্লাড-সসেজের জন্য
সেই সার্বজনীন সুধার্মিক তীর্থযাত্রা।

ভাঁড়েরা

কোথায় যায় ভাঁড়েরা সব, যায় কোথায়,
কী তারা খায়, ভাঁড়েরা ঐ কী তারা খায়,
কোথায় ঘুমোয় ভাঁড়েরা সব, শোয় কোথায়,

কী করে ঐ ভাঁড়ের দল, করেটা কী
যখন কেউ
যখন কেউই হাসে না আর
একটিবারও,
বলে না গো
মাগো!

সঙ্কে ছ-টার উৎস বিষয়ে

মানুষের সব নিয়তিই
নামের জন্য সরল হ'য়ে যায়।

সূর্যে-ঠোকরানো একটা দিন,
বাড়িঘরগুলোর নমুনা-কাঠামোর মধ্যে ছুঁড়ে-ফেলা:

আমরা হেঁটে যাচ্ছিলাম মস্ত-একটা কুকুরের মতো
আমাদের ভালোবাসাকে পেছনে টেনে হেঁচড়াতে-হেঁচড়াতে।

যদিও কে-ই বা জানে সে-কটাই বা জীবন বাঁচানো গেছে
মুখ থেকে মুখে শ্বাস ফেলে ?

আর এই কি সব, এই জারানো নিষ্ফলতা ?
কবেকার কোন্ কৌটোয় হেরিংদের এই কিচিরমিচির ?
ঠিক তাই। আর আমরা কাঁটাচামচে ধরি
বাঁ হাতে আর হাড়গুলো সরিয়ে রাখি পাশে,
শাশ্বতীর জন্য।

তোমার চোখগুলো বলাই বাহুল্য নিওনের
আর যখনই তুমি তাকাও
দেয়ালের গায়ে ঐ ফুটে ওঠে শিখার অক্ষর।

আর সেখানে কোনো কথাই নেই। কখনোই থাকে না,
যখন দিনকাল যায় খারাপ। নিয়তির দোরগোড়ায়
কবিতা চুপ ক'রে থাকে, তার নিজের তিক্ততাতেই
সে খাবি খায়।

ভাগ্যিশ তোমার কথা আমি
প্রায় কখনোই বুঝতে পারি না।

চিনে-কবি যেমন তুলি-কালির আঁচড়ে কবিতা আঁকেন
তেমনিভাবে ডাক্তারের ছুরি দিয়ে আমরা পরস্পরের গায়ে লিখছি।
কোনো-কোনো রক্ত চট ক'রেই জমাট বাঁধে।
কোনোটি আবার কেবল ব'য়েই যায় ব'য়েই যায়।

বিষয়ের গুরুত্ব মাপা হয়
কাটাছেঁড়ার গভীরতাতেই।

আমরা এক লালআলো পেরিয়ে যাই। কারণ এ-খেলার
কোনো নিয়মকানুন নেই। অনেক বছর আগে
তারা লুঠতরাজ চালিয়েছিলো আমাদের শতরঞ্চের চৌখোপে
আর, কেবল ঐ নাকডাকানো রাজারা,
চাপরাশিদের শোরগোল আর ঘোড়াগুলোর চিহিঁ-চিহিঁই
থেকে গিয়েছে এখনও।

যদিও আমি যখন তোমাকে চুমো খাই
তোমার জিভের স্বাদ
যেন দশম গ্রহের মতো মনে হয়,
যৌনসংসর্গ ছাড়াই সন্তানের জন্ম দেবার মতো।

আর এই কি সব, অন্ধকারের এই থাবা ?
নিদ্রার এইসব আত্মহত্যা, যার মধ্য থেকে
আমরা জেগে উঠি সোজাসুজি পাথরের তলায় ?
আর এই কি সব, কঙ্কালী অবশিষ্টের
এই গবেষণা ?

তোমার চলন বলাই বাহুল্য মহিমময় ;
স্তনদুটির বিভীষিকাজাগানো অব্যর্থতা।
কোনো নড়াচড়া ছাড়াই তুমি হেঁটে চ'লে যাও।

আমরা বেঁচে থাকি আশায়। সত্যিই। মগজের
ক্ষরণের মধ্যে তার পরজীবীরা আলতো ঠোকরায়।
অস্ফুট একটা ছবিই শুধু প'ড়ে থাকে।
কখনো-কখনো এমনকী তাও না।

আর তাই, আজ, এই দিনে, এখন
সন্ধে ছ-টা বাজে। ঠিক যেমন বেজেছিলো গতকাল।
ঠিক যেমন বেজেছিলো আগামীকাল।

কবিদের অমরতা বিষয়ে

মোটেই নয় : কয়েক সপ্তাহের ক্ষয়ই তো যথেষ্ট।
আর বনভবন থেকে ঝ'রে পড়ে শুকনো-সব তেফলা পাতা।
ছুঁচে-বেঁধা প্রজাপতিদের আত্মায়
শুঁয়োপোকারা ঠোকরায় সুসফল।

আমি কিন্তু এটা প্রতিপাদন ক'রে নিয়েছি যে তুমি যখন
চামড়া চুলকোও,
তখন ফোঁটায়-ফোঁটায়,
একটি ফোঁটা থেকে লজ্জা-জাগানো আরো-একটি ফোঁটায়,
জীবাণুতে-জীবাণুতে,
সংক্রামক কবিতা
চুঁইয়ে পড়ে,
অথবা ঐরকমই কোনোকিছু!

দেখাসাক্ষাতের তত্ত্বকথা

একটা রেলগাড়ি—আরেকটা রেলগাড়ির সে দার্পনিক প্রতিবিম্ব। জানলায়-জানলায় করমর্দন। সমান্তরাল চ'লে-যেতে-থাকা জানলাগুলোর কাছাকাছি লোকজনদের পরস্পরের সঙ্গে বন্ধুভাষণ।

—পরের বার—
—হ্যাঁ, পরের বার—
—পরের বার যখন আমাদের দেখা হবে—
—হ্যাঁ পরের বার যখন আমাদের দেখা হবে পরের বার।

বস্তুত পরের বার মানে তখন আর তখন বেঁচে থাকে কেবল এই ধারণাতেই যে হয়তো পরের বার ব'লে কিছু-একটা আছে।
প্রকৃতির সব প্রক্রিয়াই, এই একই নিয়ম অনুযায়ী, গড়িয়ে খুলে যেতে পারে উলটো দিকে : সমতার সূত্র আর-কি।
বলাই বাহুল্য, সমতার এই সূত্র দুর্বল ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার বেলায় কোনোভাবেই প্রযোজ্য নয়।

বাড়ি-থাকা

যখন আমরা বাড়ি থাকি, কোনো অসুখবিসুখ অথবা মাথাঘোরানো ছাড়াই আমরা ধ'রে নিই কোনো মারাত্মক সংক্রামক অনভিপ্রেত মাংসবৃদ্ধির অস্তিত্ব, জগৎ শরীরের পরিব্যক্তি আর আত্মবিধ্বংসী রোগগুলোর অস্তিত্ব। বাড়ি হ'লো অনাক্রম্যতার স্থান, যদি অবশ্য হলঘরে ঢুকেই কেউ জুতো ছেড়ে ফেলে চপ্পলে পা গলিয়ে থাকে আর শুরুয়ার মধ্যেও মশলার পরিমাণ থাকে স্বাভাবিক ও যথাযথ।

বাড়িতে থাকার মানেই হ'লো এমন অবস্থা যেখানে ফোটো-অ্যালবাম হ'লো অমরতার একটা উৎস আর আয়নার কোনো প্রতিবিম্ব বাঁচে সীমাহীন কাল, যেন রোদের টুকরোর মধ্যে কোনো প্রজাপতির খেলা।

বাড়ি হ'লো জগতের এক প্রায়-মারাত্মক পরিব্যক্তি, যেখানে ঝোঁক দেয়া হয়েছে 'প্রায়' এই উপসর্গটির ওপর।

পিতৃত্বের উৎস বিষয়ে

এখন আমি জানি। বৃষ্টির মধ্যে।
বরফের তলায়, যখন প্রতিটি পদক্ষেপ
ফেটে পড়ে তারাদের সঙ্গে-সঙ্গে
আর কেউ তাকিয়ে ছাখে নিচে থেকে।

সন্ধেবেলায়, কোনো দূর শহরে যখন
নিনাদ ক'রে ফাটে আলো, গ্রহটার ঠিক আলিশায়।
সেই-বাড়ির চিলেকোঠায় যেখানে আমি জন্মেছিলুম।
বাড়িটার মাটির তলার ভাঁড়ারে
যেখানে আমরা কাঠের টুকরোটাকরা দিয়ে জুড়ে দিতুম
মেরুদণ্ডের মতো কিছু-একটা
আর উরঃফলক, হয়তো কাজে লেগে যাবে কোনো-একদিন।

নীড়ের মধ্যে সে যে কত ফাউস্ট আর ইয়াগো
আর ডেসডিমোনা।

আমি জানি, এখন। একটু ডিমের কুসুম, প্রায়,
হাতের তেলোয় : আমি উঠে যাই সিঁড়ি বেয়ে
আর সিঁড়ি বেয়ে, ওপরে, আরো-ওপরে

সেই পুরোনো লিভিংরুমে।
কিন্তু কেউ তো থাকবে না সেখানে।
আমার চোখের কিনারে আমি দেখে ফেলি
তোমার ছোটো-ছোটো আঙুলগুলো
দরজার তলায় মিলিয়ে যাচ্ছে।

বিপরীতের উৎস বিষয়ে

যেন আকাশ ভেঙে গেলো,
এ তো ছিলো নিছকই কোনো হাতের দুটি করতল।

সে তার ডানা ঝাপটালে কিছুক্ষণ,
কিন্তু করতলদুটি বুঁজে এলো
আরো-একটু। আটকে গেলো ডানা।
সে লাথি কষালে, কিন্তু করতলদুটি
বুঁজে গিয়েছে, তার একটা পা ভেঙে গেলো।

যতবার সে একটা-কিছু নাড়িয়েছে,
করতলগুলো বন্ধ হ'য়ে আছে আর কিছু-একটা ভেঙে পড়েছে,
কাজেই কেমন বোম মেরে গেলো সে। হ'তেও পারে বুঝি
শরীরে-আড়-ধ'রে-গিয়ে চৈতন্যলোপ।

তবে এটা বুকে-হেঁটে-এগুনো উপলব্ধিটাও হ'তে পারে
যেন নীল আকাশের আর-কোনো অস্তিত্বই নেই এখন।
বরং তার বিপরীত।
যে এখানে-সেখানে আর-কোনো জলাভূমিই নেই
কোনো ফুলে ভরা।
বরং তার বিপরীত।
যে আর-কিছুই নেই এখন যাকে বলা যায় অপ্রতিরোধ্য।
বরং তার বিপরীত।
যে আর নেই কোনো শর্করাপীড়া,
আর নেই কোনো গুঞ্জন,
আর নেই কোনো সময়,
বরং তার বিপরীত।

এবং এইভাবেই হবে ব্যাপারটা। যতক্ষণ-না
কেউ হা-ক্লান্ত বিরক্ত হ'য়ে পড়ে। ঐরকম জীবন দ্বারা,
ঐরকম মৃত্যু দ্বারা, অথবা হাতের চেটোয় ঐরকম কাতুকুতু দ্বারা।

আইনের শক্তির উৎস বিষয়ে

এইবার,
যখন ঈস্টারের ছোটো রং-করা মৃত্যুর
ডিমের ওপর বসে বাড়িগুলো
আর ঝোপের আড়ালে খোঁড়া হয়
সিম্ফনি অর্কেস্ট্রা,

যখন ব্যাস্থন আর ট্রম্বোন
অতিকায় দাঁড়ায় রাস্তায়,
শরীরের জ্যান্ত ওজনের চেয়েও
বড়ো-কোনো ভিক্ষে মাগে।

আর সে, আমরা মনেপ্রাণে জানতুম যে
অন্তর্লীন ধ্বনিসময়ন, তাকে শুনতে-শুনতে,
শুনতে-শুনতে চায়ের-কাপের-তুফান,
শুনতে-শুনতে তার 'এতৎসত্ত্বেও',
কিছুতেই চিনতে পারে না বিশাল নগরীটিকে
হুড়মুড় খুদে-খুদে শিখাগুলোর জন্যে,
বুঝতেই পারে না গড়ানো পাথরের মুখোমুখি
পাহাড়ের ঘনত্বের সে কী অবসাদ

আর
অন্তত এইবারে,
প্রশ্নাহত, উত্তর দেয়

হ্যাঁ, আমি পারি।
আর যায়
যেমনভাবে যায় বাঁশি।

কী অবস্থা তার প্রতিবেদন

রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার পরিচালনাধীন ট্র্যামে-বাসে চলাফেরা করার টিকিট যে-কোনো বিড়ি-সিগারেটের দোকানেই একটু শস্তায় কেনা যায়, আমরা সামনের বা মাঝখানের বা পেছনের দরজা দিয়ে ঢুকি, আর সাবধান-করা সংকেতের পর আমাদের প্রবেশপথ থেকে স'রে দাঁড়াতে হয়। দেরি-না-ক'রেই আমরা কোন্-এক নাম-না-জানা ছোটো কলে টিকিট ঢুকিয়ে ছাপ দিয়ে নিই—যেটা এদিক থেকে কাউকে ফ্রয়েডের ইড-এর কথা মনে করিয়ে দেয়। ছাপ না-দিলে টিকিট অচল। চলার পথে আমরা কখনো চালকের সঙ্গে কথা বলি না, এমনকী সে আমাদের উদ্দেশ ক'রে কোনো কথা বললেও না।
প্রতিবন্ধীদের জন্য চারটে আসন সংরক্ষিত—তারাই বসতে পারে যারা প্রতিবন্ধী হবার অধিকারটা সরকারি দলিলে লিখিয়ে নিয়েছে। দাঁড়ানো যাত্রীদের কিছু-একটা ধ'রে-থাকা নিয়ম।

আমি একটা ট্র্যামে উঠে প'ড়ে ফোঁড়-করা পাতাগুলো থেকে টিকিটটা ছিঁড়ে নেবার চেষ্টা করলাম, যাতে কলে ঢুকিয়ে ছাপ দিয়ে নিতে পারি। টিকিটটা ছেঁড়বার আগেই, পাঁচ সেকেণ্ডের মধ্যেই, এক টিকিটপরীক্ষক আমার কাছে এসে ঘোষণা করলেন যে আমি কোনো বৈধ টিকিট ছাড়াই ভ্রমণ করছি। ভদ্র, তবে তর্কাতীতভাবে, তিনি কোনো ওজর শুনতেই অস্বীকার করলেন। আমার পরিচয়পত্র দেখতে চাইলেন তিনি—হাতে নিয়ে খানিকক্ষণ ভালো ক'রে নিরীক্ষণ ক'রে দেখলেন।

তারপর অন্যপাশ দিয়ে তিনি আমার কাছে এসে হাজির, খুব-কাছে, তারপর নিচু গলায় আস্তে জিগেশ করলেন :

আপনি? কবি স্বয়ং?

হ্যাঁ, আমি বললাম, যদিও সে যে কত বছর হ'য়ে গেলো একটি লাইনও আমি লিখিনি।

আমার পরিচয়পত্র ফিরিয়ে দিলেন তিনি, বললেন: আচ্ছা, ঠিক আছে। আপনার সব বইই কিন্তু আমার কাছে আছে।

আমার নেই, আমি বললাম।

তারপর আমি টিকিটে ছাপ দিযে নিলাম। ট্র্যামে ক'রেই গেলাম গন্তব্যে। সামনের দরজা দিয়েই নেমে পড়লাম আমি, যেহেতু এখন সেটাও মঞ্জুর।

জঙ্গলের মধ্যে কথাবার্তা

তুষার ঝরছিলো। এই জঙ্গল মনে করিয়ে দিচ্ছিলো আদিম অরণ্যকে আর প্রদোষ, প্রাগৈতিহাসিক নিশীথিনী। বুড়োগোছের একজন—তার চোখ দুটি কোমল স্নেহাতুর, পায়ে ঢলঢলে চপ্পল, মাথায় পশুলোমের টুপি—দাঁড়িয়েছিলো মুরগির ঝুড়ি আর খরগোশের খাঁচার মাঝখানে। নিজের একচিলতে কৃষিকাজের সঙ্গে কথা বলছিলো সে, যেমন অনেকেরই এমনতর অভ্যেস আছে। আমরা তাকে নমস্কার জানালে, সে এগিয়ে এসে আমাদের সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিলে।

আমরা কি কোনো পরামর্শ নিতে রাজি? হ্যাঁ, সানন্দে। আমরা কি জানি যে ভালোরা সবাই ফিরে আসে? না তো, জানি না তো। কিন্তু আসে, ফিরে

আসে, তার বয়ান, সন্ধেবেলায় তারা বিছানার শিয়রের কাছে এসে দাঁড়ায়। হ্যাঁ, সকালবেলায় তারা আবার ফিরে যায় হাতের মধ্যে। তারা ফিরে আসে রুটিতে, আর জলে, আর আইনকানুনের ভাষা-পরিভাষায়।

আর আমরা কি এই তথ্যটা জানি যে আলোকের পথ উন্মুক্ত হ'য়ে আছে? কাউকে শুধু অনুতাপ করতে হয়—তার সব অপকর্ম, ভুলভ্রান্তি, ছলচাতুরির জন্য—তাকে শুধু জিগেশ করতে হয় সবকিছুর সারমর্ম, ভাবতে হয় সর্বান্তঃকরণে আর নাছোড়, আর তারপরেই অনুধ্যান নজর রাখে আমাদের ওপর আর আলো জেগে ওঠে সব যাত্রার শেষে।

তারপর সে আমাদের সেই লোকটির কথা শোনালে, শৌচাগারের মধ্যে যে শুনতে পেয়েছিলো ন্যায়বিচারের বাণী, যেহেতু অন্য-কোথাও ন্যায়বিচারের কথা শুনতে তার বিষম লজ্জা করতো!

তারপর সে আমাদের বললে তার ছেলেদের কথা, ছেলেগুলো সব গোল্লায় গেছে, অপদার্থ সব, কেবল একজন বাদে, সে এখনও মাঝে-মাঝে দেখা করতে আসে তার সঙ্গে, যদিও তাকে সবাই ত্যাগ করেছে আর সে থাকে একেবারে একা আর জঙ্গলের মধ্যকার রাস্তায় কোনো মোটরগাড়ি চালিয়ে যাওয়া সত্যি প্রায় অসম্ভবই।

তারপর সে আমাদের বড়ো রাস্তায় যাবার পথটি দেখিয়ে দিলে আর আমাদের পেছন-পেছন এলো কিছুদূর, তার চোখ দুটি কেমন নিস্তেজভাবে জ্বলজ্বল ক'রে উঠেছিলো।

তারপর সে মিলিয়ে গেলো সন্ধ্যায়।

আমরা এই মীমাংসায় পৌঁছলুম যে এই বুড়োর স্কিৎসোফ্রেনিয়া বেশ উপভোগ্যই। তাছাড়া, কোনো জঙ্গলের মধ্যে, ট্র্যামগাড়ির চেয়ে, যে-কোনো ধরনের স্কিৎসোফ্রেনিয়া ঢের বেশি উপভোগ্য।

অন্যদিকে আমাদের ধারণা হ'লো যে জঙ্গলের মধ্যে যদি ফ্রান্‌সিস্কো পিসারোর সঙ্গে আমাদের দেখা হ'য়ে যেতো, যে সবেমাত্র ইন্‌কাদের রত্নভাণ্ডার তল্পিবোঝাই ক'রে নিয়েছে আর আতাউয়ালপার রাজাকে নির্যাতিত ক'রে দশ হাজার প্রজাকে কচুকাটা করেছে, আমরা তবু কিন্তু তাকে স্বাভাবিক ফ্রান্‌সিস্কো পিসারো ব'লেই খুবসম্ভব মনে করতুম। যদি আমাদের সঙ্গে ফ্রান্‌সিস্কো দে বেনাল কাজারের দেখা হতো, বেহেড মাতাল, যে ফিতোর সব ইণ্ডিয়ান কর্মীদেরই ধীরে-সুস্থে ঝলশেছিলো আগুনে, আমরা তাকে স্বাভাবিক ফ্রান্‌সিস্কো দে বেনাল

কাজার বলেই মনে করতুম, যে কিনা শুধু ভূগোল বিষয়েই একটু যা গোলমাল পাকিয়ে বসেছে।

কিন্তু কোনো মানুষ—যার চোখ দুটি কোমল স্নেহাতুর, যার পায়ে ঢোলা চপ্পল, যে বিনতভাবে ধ্যান করছে শুভাশুভ মঙ্গল-অমঙ্গল, যে কিনা সন্ধেবেলায় জঙ্গলে আচমকা দেখা হ'য়ে গেলে পরামর্শ দিতে চায়, তাকে কিন্তু মনে হয় কোনো পেস্তাবাদাম দেয়া কেকের মতোই মাথাখারাপ।

আমরা এই মীমাংসায় পৌঁছলুম যে আমাদের রোগনির্ণয় সঠিক, ভুলটা হয়েছিলো আমাদেরই, আর যখন গাছপালার ফাঁক দিয়ে বড়ো রাস্তাটা আমাদের চোখে পড়লো, আমরা নাছোড়ভাবে সর্বান্তঃকরণে ধ্যান করতে লাগলুম সবকিছুর মর্মার্থ।

আর দেখবামাত্র বোঝা গেলো যে এ-রাস্তাটা অতি সুপ্রাচীন, কুজকো আর সাচাউয়ামান-এর মধ্যে সংযোগ রেখেছে, ওদিকে আরো-দক্ষিণে আমরা শুনতে পাচ্ছিলুম টিটিকাকা হ্রদের জলমর্মর আর দীর্ঘবিসারী তুষার-গলার ফিশফিশ।

মাটির পায়রার উৎস বিষয়ে

তাপ দিয়ে যন্ত্র চালাবার বিদ্যার নিয়মকানুন
আমি মানি :
তুমি জিততে পারবে না
তুমি হার ঠেকাতে পারবে না
খেলা ছেড়ে বেরিয়েও যেতে পারবে না তুমি।

আমি উড়ি : যদি গায়ে গুলি এসে লাগে
আমি তবে আমি হ'য়ে উঠবো।
যদি না-লাগে
তবে আমি থেকে যাবো নিছকই মাটির একটা ডেলা।

হৈ-হল্লার মধ্যে এক পাঁড়মাতাল বেটোফেন
টলতে-টলতে খাড়া হ'য়ে দাঁড়ায় :
তার দশটা
সিম্ফনি সমেত।

আমার বদলে বাতাসই
শিস দিতে থাকে। হাড়ের মজ্জায়
সতেজ-করা ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপট।
অমরতা এক অনাবশ্যক বিলাস।
ওড়ো, উড়ে যাও, দুঃখ কোরো না।

আমি মোটেই দুঃখিত নই।
আমার দুঃখ শুধু এটাই যে
আমি জিগেশ করতে ভুলে গিয়েছিলুম
আমার নীড় কোথায়,
ভগবানের দোহাই, আমার নীড় কোথায়
ব'লে দাও।

মি | নো | টা | র·

হোলুব শ্রেষ্ঠ ৯

কবিতা সম্বন্ধে মিনোটারের চিন্তা

সন্দেহ নেই যে তার অস্তিত্ব আছে। কারণ
আমি যখন আঁধার রাতে হাঁটতে বেরুই
শামুকের খোলার মতো প্যাচাঁলো রাস্তাগুলোয়, অদৃশ্য,
আমার নিজের গর্জন প্রতিধ্বনিত ফিরে আসে
অনেক দূর থেকে।

হ্যাঁ। সে আছে। আমরা তো জানি আগেকার যুগে
ঘুরঘুরে পোকারা হ'তো অতিকায়
আর এমনকী আজকেও কেউ খুঁজে পেতে পারে লুপ্ত হস্তিযূথের বাসা
কোনো নুড়ির তলায়। পৃথিবী তখন
ছিলো আগের চেয়ে হালকা।

উপরন্তু ক্রমবিকাশ তো তা ছাড়া আর-কিছুই নয়
আবারও আরো-একবার কোনো ফো-পা করা ছাড়া তো আর-কিছুই নয়
আর কোনো-কোনো কাটামুণ্ডু যে গান গেয়ে ওঠে
তা তো হ'য়েই থাকে।

আর ভাষা আবিষ্কার করার পরেও নয়,
যেমন অনেকে বিশ্বাস ক'রে। কষ
বেয়ে গড়িয়ে-পড়া রক্ত বরং
অনেক মৌলিক আর দাঁতকপাটি
গরম ক'রে তোলে পাথুরে গ্রহদের পুঞ্জ

সে যে আছে, এটা সন্দেহাতীত।
কারণ
হাজার-হাজার ষাঁড় হ'য়ে উঠতে চায়
মানুষ
আর তার উলটোটাও।

মিনোটারের নিঃসঙ্গতা

দেয়াল, আর দেয়াল। আর একটি কণ্ঠস্বর। একটা কথা,
কত সপ্তাহ আগে বলা, ফিরে আসে
বহু বছর পরে, গর্ভবতী।

দেয়াল। আর দেয়াল। এক ছায়ার ছায়া
কি না ছায়ার ভয়ে অস্থির।
ঠিক আমাদের মতো···আমরা ক্ষমা করি না।

দেয়াল। আর দেয়াল। টুকরোরও টুকরো,
সাত-সাত বছর ধ'রে সমুদ্রের চিত্রকল্প ঢালছে একবারে শেষ
মর্মর অব্দি শুকিয়ে-যাওয়া।

দেয়াল। আর দেয়াল। আর হয়তো এমনকী
দেয়ালগুলোও নয়। আমি হয়তো কোনো
কাল্পনিক নকশার ওপর দিয়ে হাঁটছি
আর অন্য-কোনো পথ খুঁজে পাচ্ছি না ;

ফিরে দাঁড়ানোর অর্থই হবে আর-কোনো মিনোস নেই,
নেই কোনো ক্রীট, কোনো থিসিউস।
আর গিরিশিরায়
শুধু এক বয়স-বাড়তে-থাকা আরিয়াদ্‌নি
প্রতীক্ষা করে তার পতন।

মিনোটার, নির্মাতা

কোনো-কোনো দিন আমি টেবিলের কাছে আসি,
নামিয়ে রাখি আমার যন্ত্রপাতি
(হাতুড়ি, সাঁড়াশি, গজকাঠি, তুরপুন),
আমার নকশা আঁকি, লাল আর কালো,

জন্মের শাদা সীমাহীন জমির ওপর,
আর এটা জুড়ি, ওটা বাঁকাই, নাচি আর ঝালাই,
হাতুড়ি আর উকো, আত্মা থেকে আত্মায়
প্রতিধ্বনিত হয় আঘাত,
এককেন্দ্রী বৃত্তগুলো ছড়িয়ে পড়ে আর আমি
থাকি কেন্দ্রে, ঠিক কেন্দ্রবিন্দুতে।

একটা ছোটো যন্ত্র তৈরি হ'তে চলেছে,
একটা ছানা যন্ত্র : চালাবার হাতল, ঘুরঘুরে কল,
কাটিম আর তারের কুণ্ডলি, আকর্ষণ-বিকর্ষণ—
সমস্ত সমেত ; কখনো সে টিকটিক ক'রে ওঠে, কখনো
সে শোনে ;
আর প্রায় তৈরি হ'য়ে এলো ব'লে,

আর তারপরে ক্ষুর পা ঠোকে আমার তলায়,
কোনো কালো অনুষ্ঠানের ঢাকের মতো
পা ঠোকে বর্বর গ্র্যানাইটশিলায়,
দপদপ ক'রে ওঠে শিরা, ফুলে ওঠে পেশী, কণ্ডরার
কশা টান হ'য়ে ছড়ায় (হাতগুলোই শুধু কাঠ হ'য়ে আছে),

হালকা-নীল আকাশ ছুঁয়ে টান হ'য়ে দাঁড়ায় শরীর

আর বারান্দা থেকে বারান্দা দিয়ে ছুটে যায়
বন্য প্রবল উত্তেজনায়।

(ঝাঁকি লেগে কেশর থেকে ঝ'রে পড়ে ধাতুকণা)
এর মধ্যেই অনেক দূর, পাতালের ওপারে অনেক দূর।

গর্জন ক'রে উঠি আমি, পা ঠুকি, দাবি করি
সবচেয়ে রূপসী রাজকুমারীকে

তাকে…রক্তাপ্লুত স্নেহে
ধর্ষণ ও গ্রাস ক'রে ফেলবার জন্ম, কিছুই জানি
না ক্ষুর ছাড়া, ক্ষুর,
নগ্ন শরীরের ওপর প্রকাণ্ড-হ'য়ে-ওঠা ক্ষুর।

শুধু এইভাবেই আমি ভুলে যেতে পারি
যদিও জানি না
কী।

প্রেম সম্বন্ধে মিনোটার

সেনটরদের প্রেম কাঠখোট্টা
যন্ত্রণার আবর্তের মতো।

কিন্তু আরিয়াদনি যে-রাতে
থিসিউসকে নিয়তির সুতো দিয়েছিলো
(আর আমি তাদের দেখতে পেয়েছিলুম কারণ
গোলকধাঁধার দেয়ালগুলো
বিষুবলগ্নে খ'শে প'ড়ে যায়—
আর আমি যে তাদের দেখতে পেয়েছিলুম কারণ
আমিই ছিলুম থিসিউস
ঠিক যেমন থিসিউসও
আমি হ'তে পারতো)
সে-রাতে তারা মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিলো পরস্পরের
আর তার হাত ছিলো
আরিয়াদ্‌নির কাঁধে :

তাদের মুখ ছিলো থমথমে
পাতালের নদী স্টিক্‌সের ঢেউয়ের মতো আর
তাদের শরীরগুলো ছিলো পাথর।

তারা দাঁড়ালো আর চাঁদ দাঁড়ালো তাদের মাথার ওপর
আর থমকে দাঁড়ালো সাগর।
মনে হচ্ছিলো প্রেম যেন
কোনো আলোড়ন নয়,
বরং যেন সময়ের পরপারের
এক ভীষণ নির্বন্ধ।

অবশেষে তারা স্বচ্ছ হ'য়ে গেলো আর
তাদের ভেতর যে ক্রিমিকীটগুলো কুরে খাচ্ছিলো
তাদেরও চেনা গেলো ; সে জানতো যে
তার পরিণাম হবে, নাক্সোসে
জলপাইয়ের জন্য দাঁড়িয়ে-থাকা সারিতে যোগদান
যেন জীবনের সেটাই সার্থকতা
আর থিসিউস জানতো তার শেষ হবে আথেন্সে
মঞ্চের রাজা
যার প্রেমিকার সংখ্যা দশ
আর যার যকৃতে কর্কটরোগ।

কিন্তু এখন তারা দাঁড়িয়ে রইলো, এর কাঁধে ওর হাত,
আর চাঁদ দাঁড়িয়ে রইলো তাদের মাথার ওপর,
আর থমকে দাঁড়ালো সাগর। আর
এই প্রেমের মুখোমুখি প'ড়ে
আমার ষাঁড়ের মাথা দিয়ে আমি বালি কোপালুম
আর মরিয়াভাবে
দেয়াল ভেঙে ফেলতে শুরু ক'রে দিলুম,
চেঁচিয়ে উঠলুম, থিসিউস, থিসিউস,
থিসিউস, আমি তোমারই জন্য অপেক্ষা ক'রে আছি,

আর গোলকধাঁধা শব্দগুলোকে পরিণত ক'রে ফেললো
আমারই
হোমরীয় অট্টহাসিতে।

যখন অষ্টমবার একই জায়গায় ফিরে এলো
গলা ঝেড়ে সে চেঁচিয়ে বললে :
মিনোটার, সত্যি ! ঘটে খানিকটা বোধবুদ্ধি আনো।
তোমাকে কথা দিচ্ছি, বেরুবার রাস্তাটি দেখিয়ে দিলেই
আমি তোমাকে বিশ-বিশটি খুপসুরৎ ছুকরি পাইয়ে দেবো।
এ একেবারে পাকা কথা, মিনোটার।

দৃষ্টির বাইরে থেকে আমি উত্তর দিলুম :
আমি অবাক হ'য়ে ভাবি যে তোমার এটা
জানা আছে কি না যে দৈত্যদানো ব'লেও কিছু আছে ?
গুঁজে রাখো তো।
সে উত্তর দিলে : পাগলামি কোরো না। বিশ্বাস করো,
কোথায় দারুণ টাকা কামানো যায়, আমি জানি।
আধাআধি বখরা, অ্যাঁ, ঠিক তো ?
আমি স্বাভাবিক লোক, মিনোটার,
তুমিও কেন স্বাভাবিক হও না !

আমি উত্তর দিলুম :
তোমার কি জানা আছে যে স্বাভাবিকতা
আসলে হাঁদামিরই একটা
মোলায়েম সংস্করণ ?
গুঁজে রাখো তো !
চেঁচিয়ে উঠলো সে : এটা বুঝতে পারছো না যে
লোকের সঙ্গে ভাব রাখলে আখেরে কাজ দেয়।
লোকের সঙ্গে মিলে কাজ করো,
সার্জেণ্ট আমাদের বলতো ছারপোকা তাড়াবার গুঁড়ো ওষুধ
ছড়াতে-ছড়াতে, দেখবে কাজ হবে।
কাজেই অমন ঠ্যাটামি করছো কেন ?

এখানে তো লবডঙ্কা, বাচ্চার জন্য একটা চুষিকাঠিও
জোটাতে পারবে না!

তুমি কি বুঝতে পারছো না যে তুমি বেঁচে আছো
ছুঁচের ডগায়—আর ছুঁচটা তোমার ইতিহাসের
ছেঁড়া নেংটিতে তাপ্পি লাগাচ্ছে?
আর, বাছা, খুলেই বলো দেখি
তোমার আসল মৎলবখানা কী?
এই তো মরদ কা বাৎ,
সে উত্তর দিলে : মৎলব···তা ফিরে-যাওয়াই,
বোধকরি। পয়সা করা।
আর এই গোলকধাঁধার নকশার একটা নকলও চাই এক্ষুনি,
হয়তো কাজে লেগে যাবে,
যদি তুমি বাস্তববাদীর মতো ব্যাপারটার দিকে তাকাও···
তাকে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বার ক'রে দেবার জন্য
দানবদের হাতে তাকে তুলে দিলুম তখন।
আর ঐ ছারপোকামারা গুঁড়ো ছড়িয়ে দিলুম
সব প্যাঁচালো গলিতে।

সন্দেহ নেই যে অনেকদিন বেঁচেছিলো সে
আর কুকুরদৌড়ের বাজিতে
বেশ নামও কিনেছিলো।

ডেডেলাস

গোলকধাঁধায় তন্নতন্ন ক'রে খোঁজে ডেডেলাস।
স্বয়ংপ্রসবী সব দেয়াল।
পালাবার কোনো রাস্তা নেই।
পাখা ছাড়া।

কিন্তু চারপাশে—এই অতজন ইকারুস! গিশগিশ করছে!
শহরে, শস্যক্ষেতে, সমভূমিতে।
বিমানবন্দরের বিশ্রামাগারে (স্বয়ংক্রিয়
সব বিদায়বাণী),
মহাজাগতিক নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রে (অর্ধবিদ্যুৎবাহী
দেহপ্রেরক যন্ত্র);
খেলার মাঠে (ছাত্র রংরুট করা হচ্ছে,
১৯৬০-এর শ্রেণী);
প্রত্নশালায় (শ্মশ্রুর
সোনালি কৈশিকতা);
ছাতে (কল্পনার
রামধনু ছোপ);
জলাভূমিতে (রাত্রে গাধার ডাক,
১৬৪০-এর শ্রেণী);
পাথরের গায়ে (রাসায়নিক আঙুল
ওপরটাকে দেখাচ্ছে)।
সময় ভর্তি ইকারুসে-ইকারুসে,
হাওয়া ভর্তি ইকারুসে-ইকারুসে,
মেজাজ ভর্তি ইকারুসে-ইকারুসে।

চার লক্ষকোটি ইকারুস
শুধু একজন বাদে।

আর ডেডেলাস কি না এখনও
ঐ পাখাগুলোই
উদ্ভাবন করেনি।[১]

১ এই কবিতাটির এই পাঠ একটু অন্তরকম, পূর্ববর্তী পাঠটার চাইতে। আরো: মিনোটার ও গোলকধাঁধার কবিতাপর্যায়ের মাঝখানে এর অর্থও সম্ভবত একটু বদলে যায়।

ঠিক জায়গায় পাথরটা গড়িয়ে ফেলতে না-পেরে,
পাথর, কিংবা যা-হোক কিছু-একটা হবে, হয়তো
কোনো স্ফটিকের রূপক, কিংবা কাগজ,
আমি ঠিক করলুম দোষটা নিশ্চয়ই আমারই।
দোষত্রুটি সম্বন্ধে বড়ো কথা এটাই যে তাদের শোধরানো যায়,
মা আমায় বলতেন।

তো আমি ঠিক করলুম দোষটা আমারই।
আর আবারও ঠিক ততটাই যোগ ক'রে দিলুম
পাথরের ওজনের সঙ্গে। কিছু-একটা যা-হোক হবে,
হয়তো ঘৃণা, কিংবা প্রেম।
আর অমনি ব্যাপারটা অনেক ভালো হ'য়ে এলো। কারণ

এই নিশ্চয়তা তো ছিলোই
যে একসময়
ওটা আমার ঘাড় ভাঙবে।

দেখতে-না-দেখতে কফি খাওয়ার সময় এসে গেলো।
আর আমি বুঝতে পারলুম
হিস্টিরিয়া কিছুরই সমাধান নয়॥

মিনোটারের কুলুজি সম্বন্ধে

যদিও এটা খুবই সম্ভব যে আমি[illegible]ছি মিনোটার, শ্রীল শ্রীযুক্ত, সেই রাজপুত্তুর যার স্বভাবচরিত্র ঠিক তেমন-বি[illegible]ছিলো না (কোন্ রাজপুত্রেরই আছে বা ছিলো, শুনি?) আর তাই গোলকধাঁধাটা বানানো হ'লো যাতে আমাকে বা আমার মোটা মুণ্ডুকে কেউ আর-না-দেখতে পায়, জ্‌বিগ্‌নিয়েভ হেরবের্ট যেমন বিশ্বাস করেন। যার ফলে শেষকালে নামজাদা পালোয়ান থিসিউসকে ভাড়া ক'রে আনা হ'লো, যার হাতে আমার কাটামুণ্ডুটা এই প্রথমবার—এই অবশ্য শেষবারও—কোনো-একটা উপলব্ধির চেহারা নিলে।

যদিও এটাও খুবই সম্ভব যে আমি হলুম মিনোটার, শ্রীল শ্রীযুক্ত, থিসিউসেরই অন্ধকার দ্বৈতসত্তা, গোলকধাঁধায় তার সঙ্গে যার দেখা হয় আর নিজের যে-বিকল্প অহংকেই সে ওখানে মেরে ফ্যালে, জর্জ নেভিউ যেমন বিশ্বাস করেন।

যদিও এটা খুবই সম্ভব যে আমি মোটেই নই : বরং নিছকই কোনো পৌরাণিক ছায়া যে যুগে-যুগে ভোল পালটায়, প্রতিদিন, রোজ। ক্রীট যেখানে ক্রীটের ওপর চিৎপাত-পড়া, সেই আবর্জনার স্তূপে এক শূন্যতা। মাথার মধ্যেকার এক জায়গা মাত্র, প্রবহমান চৈতন্যের তীরে এক ঝোপ, অন্যদের চিন্তা নিয়ে যে-নদী ব'য়ে যায়, যার উপরিতলে তোমার নিজেরই গতকালকের মুখ ভেসে ওঠে। গত বছরের মুখ। বহু বছর আগেকার মুখ। কিন্তু কারু নিজের মুখটাও তো পৌরাণিক ছায়াই—না-গড়া প্রাসাদের আবর্জনার স্তূপে ফাঁকা এক জমি। কোনো সামঞ্জস্য নেই। কোনো পারম্পর্য নেই। নেই কোনো ইতিহাস। যা মোটেই দেখা উচিত নয়। না-দেখার মধ্য দিয়ে যা দেখা যায়। যা কারু মনে থাকে না। যা ভুলে-যাওয়া যায় না। প্রতিদিন মরবার জন্য যা বাকি থেকে যায়। কখনো মরে না, যদিও।

যদিও এটাও খুবই সম্ভব যে আমি হলুম সেই লোক যাকে কেটে-ছেঁটে মাপ মতো ক'রে আনা গেছে।

গোলকধাঁধা সম্বন্ধে মিনোটারের চিন্তা

সূর্যাস্ত। আবার আরেকবার। আলতোভাবে কুঁকড়ে-যাওয়া, ঠাণ্ডায়, গরমে, বহুধাছিন্ন ব্যক্তিত্ব থেকে, বন্ধ্যা মহত্ত্ব থেকে, অতিপর্যাপ্ত নীচতা থেকে ; ক্ষণজীবীত্ব আর পরিবর্তনহীনতা, অপ্রয়োজনীয় [illegible] উদ্দেশ্যহীনতা। আর আমি তোমাদের দেখে যাচ্ছি, পিন[illegible]র মতো বোধ নিয়ে। কোনো-এক ধরনের বিষাদের ভেতরে পোরা গাঁজলা-তোলা কোনো-কিছু। জগৎটা যদি সত্যি এইরকমই হয়, তাহ'লে কেয়াবাৎ, কেমন দারুণ মজা। কিন্তু তোমরা তো এর মধ্যেই অবচৈতন্যের প্রতীকে-মূর্ত শিকড়ের সন্ধানে তোমাদের তীর্থযাত্রায় বেরিয়ে পড়েছো। স্বপ্নের প্রাতিস্বিক প্রতীকের মধ্যে মূর্ত, শিল্পের যূথবদ্ধ প্রতীকের মধ্যে মূর্ত। তোমরাও-দেখতে-পারো এমনি-সব

মনের গড়া বিভীষিকা : টয়েনবি যাকে মনের দুয়ার খোলবার পৌরাণিক চাবি হিশেবে অনুসরণ করেছেন। ইয়ুং যাকে হাৎড়ান সান্দ্র, অন্ধকার, মাঙ্গলগ্রহিক প্রাথমিক সম্পর্কের সূর্যবেঁধা জঙ্গলে। যেখানে লাফিয়ে ওঠে ব্যক্তিগত রাক্ষস আর নৈর্ব্যক্তিক আবেগ। যেখানে ফেটে পড়ে অকল্পনীয় রতিশক্তি, যেখানে ঝিলিক দিয়ে ওঠে স্পেনসারের রুপোলি চাঁদ আর মিলটনের সূর্যপ্রখর তলোয়ার। দেখলে তো, পশ্চাদ্‌গামী কবিতা।

বাঁদররা সব বই কিনছে।

অন্যত্র গরিলারা তাদের গবাগব খায়। কাঠবেড়ালির পাকা চাকরিতে সিংহ আর সিংহর স্থায়ী চাকরিতে কাঠবেড়ালি! দস্তানার তেতরটা বাইরে বের-করা, হাত প'ড়ে আছে নিরুপায়। অস্ত্র আছে বাইরে, কারণ ভেতরে আছে স্থৈর্য-দায়ক ভার। বাইরেটাই ভেতর, কারণ সে তো তা-ই তাকে নিয়ে যা-ই ভাবা যায়, আর, বাস্তবিক, সেই জন্যই তো সে আছে। গোলকধাঁধার মধ্যে তুমি নিজের ভেতরকার চোরাবালিগুলোকে খোঁজ করো না—বরং খোঁজ করো বাইরে থেকে সরাসরি আলোকসম্পাত। অবচৈতন্যের প্রতীকগুলো সব ফাঁস হ'য়ে গেছে কারণ সৃষ্টিকর্তারা কেউ জানে না তারা কী বানাচ্ছে। বস্তুর আগেই রূপক, আর কবিরও আগে। মার্ক্স এর্ন্স্টের মাছ হাওয়ায় সাঁৎরায়, পাউল ক্লের চারপেয়েরা দেয়ালে ঘেউ-ঘেউ করে। শ্রোণীর হাড়ে তৈরি সব দালান, আর সময়ের যন্ত্রে পিঁপড়েদের তাড়া। যদি আমি বলি টেস্ট-টিউব, সে কেবল আমার হাত কাচ ছোঁয় ব'লে। আমি যদি বলি বাতিগুলো হাসে, সে কেবল এই জন্যেই যে তারা সত্যি হাসে, আমার মধ্য দিয়ে আলো ছড়িয়ে দেয়। বিদ্যুৎতরঙ্গ ঢুকে পড়ে আমার মধ্যে যাতে আমি জেলিমাছের মতো স্বচ্ছ হ'য়ে যাই। আমি যা-ই বলি না কেন, তা আদৌ আমি বলি কি না জানার উপায় নেই, কারণ তা নিজে থেকেই বলা হ'য়ে যেতো।

কবিতা জগতেরই সমান আর তারই মধ্য দিয়ে বাঁচে।

প্ররোচিত কবিতা।

আমার শিরাগুলো দিয়ে ব'য়ে যায় পরিশ্রমী উল্লাস আর আমার ষাঁড়ের মাথায় চ'ড়ে যায়। সত্যি-বলতে, উপভোগের জন্যই যদি না-হবে, তাহ'লে খামকা কেন কেউ এত ঝামেলা পোয়াবে?

আপনি একজন কবি ?
হ্যাঁ, আমি কবি।
কী ক'রে জানেন ?
আমি একটা কবিতা লিখেছি।
যখন কবিতা লেখেন, তখন আপনি কবি। কিন্তু এখন ?
কোনো-একদিন আরেকটা কবিতা লিখবো আমি।

তখন হয়তো আপনি আবার কবি হবেন। কিন্তু ও-যে সত্যি কবিতা হবে, তা আপনি কী ক'রে জানবেন ?
ঠিক আগেরটার মতোই হবে ওটা।

তা যদি হয় তো সে মোটেই কবিতা হবে না। কোনো কবিতা শুধু একবারই হয়—দু-বার সে কখনো একরকম হয় না।
আমি বলতে চেয়েছিলুম যে ঠিক আগেরটার মতোই ভালো হবে।

কিন্তু আপনি নিশ্চয়ই সত্যি-সত্যি তা বলতে চাননি। কোনো কবিতার ভালোত্ব কেবল একবারই সম্ভব—আর তা আপনার ওপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে পরিস্থিতির ওপর।
আমার অনুমান পরিস্থিতি একই রকম থাকবে।

তাই যদি আপনার মত হয়, তবে কস্মিনকালেও আপনি কবি ছিলেন না, এবং কোনোকালে হবেনও না। অথচ তবু কেন নিজেকে আপনি কবি ব'লে ভাবেন ?

সত্যি-বলতে, আমি নিজেই জানি না…
কিন্তু আপনি কে ?

র | ক্ষা | ক | ব | চ

'কবিতা, তোমায় দিলাম আজকে ছুটি', একদিন বলেছিলেন আমাদেরই একজন কবি, যখন পৃথিবী তাঁর কাছে গদ্যময় মনে হয়েছিলো, ক্ষুধার জন্য। কিন্তু শুধু কি ক্ষুধা? শুধু দুর্ভিক্ষ, আর তজ্জনিত হাহাকার? যুদ্ধ, সাম্রাজ্য, ঔপনিবেশিকবাদ, জাতিহত্যা, যুদ্ধ, কনসেনট্রেশন ক্যাম্প, গ্যাসচেম্বার, রাজনীতির ফেরেব্বাজি, সাম্প্রদায়িকতা, যুদ্ধ, শিক্ষাব্যবস্থা, বহুজাতিক বাণিজ্যসংস্থা, ঠাণ্ডালড়াই, সামরিক অভ্যুত্থান, যুদ্ধ, কীটনাশক প্রস্তুত-ব্যবস্থা, বিমান ছিনতাই, জাতিহত্যা, 'জেল-থেকে-পালাচ্ছিলো-ব'লে-পেছনে-গুলি', যুদ্ধ, ছোটোদেশের দিনশেষ, সুপার-পাওয়ারের মচ্ছব, সুপার-লোহেনগ্রিনের ধুন্ধুমার আওয়াজ, যুদ্ধ···

শুধু আউশভিচ দেখেই এককালে অডেন বা আডোর্নো বলেছিলেন, 'এর পর আর কবিতা হয় না', যেন আউশভিচ, বুখেনভাল্ড, বা বেলসেনেই আমরা প্রথম আবিষ্কার করেছিলাম 'অপাপবিদ্ধের নির্বিচার হত্যা'। যেন আমাদের কাছে দলিল ছিলো না কেমন ক'রে তৈরি হয়েছিলো এশিয়া, আফ্রিকা বা লাতিন-আমেরিকার উপনিবেশগুলি; যেন আমরা চোখে ঠুলি বসিয়ে, কানে তুলো গুঁজে, পিঠে কুলো বেঁধে, পেটে কিল মেরেই এতকাল—এ ত কা ল—বেঁচে ছিলাম। কিন্তু উপনিবেশ তৈরিতেই যেমন ইতিহাসের শেষ নয়, তেমনি আউশভিচ বা বুখেনভাল্ডের বিদ্যুৎজ্বলা কাঁটাতারের বেড়াতেই ইতিহাস মুখ থুবড়ে পড়েনি।

কিন্তু, কবিতা? তাকে কি আমরা ছুটি দিয়েছি, তবে? এইসব নৃশংস জীবনবিরোধিতার মধ্যে কি তবে কবিতা ঘাড় মটকে চোখমুখ উলটে পায়ের পাতা ঘুরিয়ে দিয়ে আচমকা থুবড়ে পড়েছে? তার কি তবে ছায়া পড়ে না আর? রামনাম শুনলেই সে তবে কি ভুউশ ক'রে শূন্যে মিলিয়ে যাবে, অথবা ধাপার মাঠে নিছকই ট্যাঁড়শ ফলাবে—সার হ'য়ে যাবে শুধুই, শুধুই ইউনিয়ন কারবাই-ডের কী-বাহার কেরামতি, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, মারণকৃতিত্ব হ'য়ে উঠবে? কবিতার কি এখানে কিছুই করার নেই? সে কি এখনও ব্যস্ত থাকবে কেবলই গোলাপ, রাজার দুলাল (এবং দুলালী), প্রতীকীবাদ, 'বস্তুবাদ—সে দুঃসংবাদ', আত্মার লাঞ্ছনা, খরগোশ, নিজস্ব ঘুড়ি, নীরা, 'দীর্ঘতম বৃক্ষে তুমি ব'সে আছো দেবতা আমার', হলুদ সংসার, 'ছেড়ে দাও জগতেরে, যাক সে যেখানে যাবে', ভাবোচ্ছ্বাস,

চমকপ্রদ বেগনি-পেরোনো আকৃতি বা আততি, 'শুধু তা-ই পবিত্র, যা ব্যক্তিগত', মন-ভালো-নেই, তুমি-কী-সুন্দর, 'তুমি যেখানেই যাও আমি যাবো তোমার পেছন-পেছন', 'বস্তুবাদ—সে দুঃসংবাদ' ···এইসব নিয়ে? তবে তো অডেন বা আডোর্নো কিছু ভুল বলেননি। এই যদি হয় কবিতা, শুধু এইটুকুই, তবে কী দরকার তোমাকে দিয়ে? আমরা, তাহ'লে, চাই অ্যান্টি-কবিতা, কবিতার উলটোটাই, অন্তত এতকাল কবিতা ব'লে যা আমাদের শোনানো হয়েছে, তা নয়। অত ভালো-ভালো কথা কবিতায়, আত্মা ফুল সৌন্দর্য, মুক্তি, 'বস্তু-পেরোনো অতিবেগনি আলো', 'বাগানটা নেই—কেননা দুশো বছর পর হয়তো থাকবে না, হয়তো থাকবে না এমনি সাজানো, আবার বাগানটা আছে কেননা আমি তো তাকে নিজের চোখেই দেখেছি', আমি আর তুমি, আকাশে চাঁদ, এই তো মলয় সমীরণ, বুকের মধ্যেটায় হু-হু ফাঁকা ভাব···এইসব, এই মতো সব, কিন্তু, কদাপি, আটকে রাখেনি কনসেনট্রেশন ক্যাম্প বা গ্যাসচেম্বার। কবিতা তা'হলে রক্ষা-কবচ নয় সভ্যতার, কিংবা নয় চামড়ার ওপরই বসানো কোনো বর্ম। আর সেইজন্যেই, আজকে, তাহ'লে, চাই কবিতার বদলে অন্যকিছু,—কবিতার উলটোটাই, তার বিরুদ্ধপক্ষ, তার সর্বনাশ (তার মুক্তিও), অন্যরকম কোনো-কিছু, 'পদলালিত্য ঝংকার' মুছে-ফেলা কথা, গলার মধ্যে বিঁধে-যাওয়া কোনো কাঁটা, অন্যরকম কোনোকিছু, বিস্বাদ, বিরস, বিসদৃশ···অর্থাৎ অ্যান্টি-কবিতা, প্রতি কবিতা, চাই কী, অকবিতাও। 'কাকে বলে কবিতা, যদি তা না-বাঁচায় দেশ অথবা মানুষ', যেমন জিগেশ করেছিলেন পোলাণ্ডের চেশোয়াভ মিউশ। যেহেতু কবিতা—এতকালের কবিতা—বাঁচায়নি কাউকে—না দেশ, না মানুষ—সেইজন্যেই তবে চাই এমনকিছু যে মানুষ দেশ ভাষা—এইসবকে বাঁচাতে বদ্ধপরিকর।

কী তবে সেই এমন-কিছু? একটা পরীক্ষায় তাহ'লে বসা যাক, যদি আমরা জানতে চাই তার উত্তর।

অ্যান্টিপোয়েট কাকে বলে

শবাধার আর ছাইদানের কোনো ব্যাবসাদার?
এমন সেনাপতি যে নিজেদের ক্ষমতায় দ্বিধাগ্রস্ত?
এমন পুরুৎ যে কিছুতেই বিশ্বাস করে না?

এমন-কোনো ভিখিরি-ভবঘুরে যে সবকিছু নিয়েই
হাসাহাসি করে এমনকী বার্ধক্য আর মৃত্যু নিয়েও ?
কোনো বদমেজাজি বাক্যবাগীশ ?
খাদের পাশে নাচতে-থাকা কোনো নাচিয়ে ?
সারা জগতের প্রেমে পড়েছে এমন-কোনো নার্সিসাস ?
এক রক্তমাখা ভাঁড় যে ইচ্ছে ক'রেই যা-দশায় পড়েছে ?
চেয়ারে ব'সে ঘুম লাগায় এমন-কোনো কবি ?
এক অত্যাধুনিক কিমিয়াবিদ ?
বৈঠকখানার কোনো বিপ্লবী ?
কোনো পাতিবুর্জোয়া ?
কোনো ছ্যাবলা ? কোনো হোতা ? অপাপবিদ্ধ কেউ ?
সানতিয়াগো চিলির কোনো চাষী ?
যে-বাক্যটি নির্ভুল মনে হয় তার তলায় লাইন দাগো।

কাকে বলে অ্যান্টি-পোয়েম ?

চায়ের পেয়ালায় তুফান ?
পাথরের গায়ে একফোঁটা তুষার ?
কোনো দইশজির বাটি যা মানুষের মলমূত্রে ভর্তি,
যেমন বিশ্বাস করেন ফ্রানসিসকান বাবারা ?
সত্যি-কথা বলে এমন-কোনো আয়না ?
দু-ঠ্যাং ফাঁক-করা কোনো মেয়ে ?
লেখকসমিতির সভাপতির নাকে এক ঘুষি ?
(ভগবান তাঁর আত্মা রক্ষা করুন !)
তরুণ কবিদের উদ্দেশে কোনো সাবধানবাণী ?
জেটবিমানের চাকালাগানো কোনো শবাধার ?
কেন্দ্রাতিগ শক্তিতে ছুটতে-থাকা কোনো শবাধার ?
কেরোসিনের শবাধার ?
কোনো লাশ নেই এমনকোনো সৎকারগৃহ ?
যে-সংজ্ঞার্থটি সঠিক মনে হয় তার পাশে ঢ্যাড়া বসাও।

এই অ্যান্টি-কবিতাটির লেখক অবশ্য হোলুব নন, চিলির নিকানোর পাররা। কিন্তু এটাই মনে-রাখা চাই যে, কী-একটা যেন বদলে গিয়েছে পৃথিবীর কবিতায়

—দ্বিতীয় যুদ্ধের পর, বিশেষত। শুদ্ধ কবিতার বিরুদ্ধে জিহাদ অবশ্য শুরু হয়েছে অনেকদিনই—পরাবাস্তববাদ, অভিব্যক্তিবাদ ইত্যাদি আন্দোলনের কথা কে না জানে। তাছাড়া বেরটোল্‌ট ব্রেখ্‌ট যেমন জার্মানিতে, হিউ ম্যাকডেয়ারমিড যেমন স্কটলাণ্ডে, তেমনি কিউবায় নিকোলাস গিয়েন, পেরুতে সেসার ভায়েহো, চিলিতে পাবলো নেরুদা শুদ্ধ কবিতার বিরুদ্ধে অনবরত ও অবিশ্রাম লড়াই চালিয়েছেন। এটা নেহাৎই কাকতাল নয় যে নেরুদা একবার পার্‌রার সঙ্গে মিলে যুগ্মভাবে একটি বই লিখেছিলেন।

হোলুব, তাই, একা নন। আমরা পর-পর নাম ক'রে যেতে পারি পাশ্চাত্ত্যের প্রধান কবিদের, যাঁরা এই প্রতিকবিতার প্রবক্তা। পোলাণ্ডে জ়বিগ্‌নিয়েভ হেরবের্ট আর তাদেউশ রুজ়ভিচ, ইউগোস্লাভিয়ায় ভাস্‌কো পোপা আর ইভান লালিচ, হাঙ্গেরিতে ইয়ানোস পিলিন্‌শ্‌কি, জার্মান ভাষায় হান্স মাগন্থুস এন্‌ৎসেন্‌স্‌বারগার আর পেটার হান্‌ট্‌কে, ইংলণ্ডে এড্রিয়ান মিচেল—এমনি অনেক নাম নিশ্চয়ই মনে প'ড়ে যাবে পাঠকদের। প্রধান একটা সাদৃশ্যসূত্রও হয়তো আবিষ্কার করা যাবে এঁদের মধ্যে। বিশেষত মনে প'ড়ে যাবে এই কবিদের শ্লেষ-পরিহাসের রণকৌশল। এই শ্লেষ কোনো শৌখিন বিরক্তি বা বীতরাগ থেকে আসেনি—যেমন হয়তো পাওয়া যায় টি-এস এলিয়টে। এই শ্লেষ বরং আত্মরক্ষারই উপায়—সমস্ত লাঞ্ছনা ও সর্বনাশের মধ্যে নিজেকে বাঁচাবার একটা রক্ষাকবচ, একটা দায়দায়িত্বের স্বীকৃতি ও অঙ্গীকার। এই শ্লেষ আবার শাঁখের করাতের মতো—দু-দিকে ধার, দু-দিকে কাটে, যেমন সে ছোঁয় জগৎকে, তেমনি কবিকেও। অর্থাৎ এই শ্লেষ মরীয়া মানুষের শ্লেষ। শ্লেষ তাকে দেয় মাত্রাবোধ, সংগতির সৌষ্ঠব আর আরো-সব আর্ত, করুণ ও মরীয়া মানুষের প্রতি মমতার অনুভূতি।

এই শ্লেষ ছাড়া হোলুবের কবিতায় যেটা সবচেয়ে প্রথমেই চোখে পড়বে, সেটা তার স্বচ্ছতা ও দৃঢ়তা, আর বুদ্ধির দীপ্তি। জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে রূঢ়-কঠোর সব সত্য বলেন হোলুব, আর সেই সত্যের মুখোমুখি হ'য়ে আমরা বুঝতে পারি তাঁর শিকড়-প্রোথিত যুদ্ধোত্তর ইউরোপে—অর্থাৎ ইতিহাসে। পোলাণ্ড, চেখোস্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরি, ইউগোস্লাভিয়ার মানুষ কিসের মধ্য দিয়ে গিয়েছিলো, সহ্য করেছিলো সে-কোন ভীষণ চাপ ও আততি, অনিবার্যভাবেই তা গ'ড়ে দিয়েছে তাদের শিল্প ও সাহিত্য—শিল্পের দায়িত্ব কী, সেই সম্বন্ধেই প্রশ্ন করেছে, অনুভব করেছে সারূপ্যের সংকট, আর সভ্যতারও। যুদ্ধ, কনসেনট্রেশন ক্যাম্প,

গ্যাসচেম্বার যেখানে মর্মঘাতীরূপে বাস্তব, সেখানে কী মূল্য আছে ভাষার? কী অর্থ হয় সাহিত্যের? কীভাবে জীবনের কাজে লাগবে শিল্প? এ-সব জটিল ও জরুরি প্রশ্নের উত্তর হাৎড়াতে চাচ্ছে ব'লেই মাঝে-মাঝেই হোলুবের কবিতা হ'য়ে উঠেছে বস্তুঘনিষ্ঠ ও নৈর্ব্যক্তিক। হোলুব তাঁর কবিতাকে বর্ণনা করেছেন 'পুরোপুরি খোলামেলা কবিতা' ব'লে; তাঁর কবিতার গড়ন আর ভঙ্গি এতই প্রত্যক্ষ, অব্যবহিত ও সোজাসুজি যে কোনো রোগাপটকা হ্যাকা-বোকা বিষয়-বস্তু তার মধ্যে টিকতেই পারতো না।

মিরোস্লাভ হোলুব চেখ। (চেখ 'হোলুব' কথাটার অর্থ পায়রা—মাটির পায়রা নিয়ে হোলুব যে-কবিতা লিখেছেন, এই তথ্যটা মনে রাখলে তার তাৎপর্য নিশ্চয়ই অনেকটাই বেড়ে যায়। তেমনি বর্ণমালা থেকে যখন ব্যঞ্জনবর্ণ ম-টাই হাপিশ হ'য়ে যায়, তখন আমাদের মনে প'ড়ে যায় তাঁর নামের আদ্যক্ষরেই ম আছে।) চেখ সাহিত্যে লোককথা ও অসংবরণীয় পরিহাসপ্রিয়তার যে-ঐতিহ্য আছে, হোলুব উঠে এসেছেন তার মধ্য থেকেই। আর এ-তথ্যটাও জরুরি যে হোলুব গবেষক ও বৈজ্ঞানিক। প্রাহায় মেডিক্যাল ইনস্টিটিউটে তিনি ইমিউনো-লজি নিয়ে গবেষণা করেন—এই গবেষণার সূত্রেই এককালে গিয়েছিলেন ফ্রাইবুর্গ বা নিউ-ইয়র্ক। কিন্তু পূর্ব-ইউরোপের কোনো-কোনো লেখকের মতো তিনি দেশত্যাগী বা দেশান্তরী কবি নন—গবেষণার কাজ শেষ হ'তেই আবার তিনি ফিরেছেন প্রাহায়: চেখোশ্লোভাকিয়ার বাইরে বেশিদিন থাকার কথা তিনি ভাবতেই পারেন না।

একজন বৈজ্ঞানিক যখন কবি হন (আমাদের মনে প'ড়ে যায় নিকানোর পার্‌রার কথাও, যিনি সানতিয়াগোয় পদার্থবিদ্যা পড়ান) তখন আমাদের এই ভেবে একটু অবাকই লাগে বিজ্ঞান কেমন ক'রে কবিতাকে সমৃদ্ধ করে। হোলুবের বেলায় দেখতে পাই বিজ্ঞান কবিতার দিগন্তকে সম্প্রসারিত করেছে। বৈজ্ঞানিক ভাবনা যে শুধু বিষয়ের সঙ্গে তাঁর দূরত্বই ঘটিয়েছে তা নয়—তাঁর এই বিশেষ দৃষ্টিকোণটিও তৈরি ক'রে দিয়েছে, এনে দিয়েছে অন্তরঙ্গ ও অতি-ব্যক্তিগত প্রসঙ্গেও একটা নৈর্ব্যক্তিকতার বোধ। তাঁর কবিতার চিন্তাশীল পরিহাস যেন কোনো গভীর আঁধারপ্রহসনেরই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। কবিতা যে কেমন ক'রে বিজ্ঞানের সহায়তায় বলিষ্ঠ ও শক্তিশালী হ'য়ে ওঠে তার প্রমাণ হোলুবের কবিতার রূপক ও উৎপ্রেক্ষা: তাঁকে তিনি যেন অনুমান বা কল্পনা হিশেবে ব্যবহার করেন, যেন কোনো ল্যাবরেটরিতেই পরীক্ষা ক'রে দ্যাখেন তা

অভিজ্ঞতার চাপ আর জ্বালা সইতে পারবে কিনা। যদি কোনো চিত্রকরের সঙ্গে তাঁর তুলনা করতে হয়, তবে সে পাউল ক্লে অথবা হুয়ান মিরোর সঙ্গে। তাঁদের ছবির মধ্যে যে-খেলা, যে-প্রহসন, যে-ফুর্তি, তা অবশ্যই হোলুবের কবিতাতেও লক্ষ করা যাবে।

ষাটের দশকের শেষে ও সত্তর দশকের গোড়ায় আন্তর্জাতিক কবিতামেলা-গুলোতে বারবেডোসের কবি এডওয়ার্ড কামার্ড ব্রাফেট আর ইউগোস্লাভিয়ার কবি ভাস্‌কো পোপার মতো মিরোস্লাভ হোলুবের কবিতাপাঠ ছিলো শ্রোতাদের কাছে এক অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা। প্রায় শল্যবিদের মতো শ্লেষ-পরিহাসের ছুরি বসান হোলুব কবিতার বিষয়ের মধ্যে, কিংবা হয়তো অণুবীক্ষণের মধ্যে বীজাণু যেমন তেমনিভাবেই শব্দগুলোকে তন্নতন্ন ক'রে হাৎড়ে দ্যাখেন এই ইমিউনো-লজিস্ট। কিন্তু তাঁর গলার স্বর—ভারি, গম্ভীর, গমগমে—প্রত্যেকটি শব্দকে সে-সব কবিতাপাঠের আসরে বিশেষ চাপ দিয়ে পৌঁছে দিতো শ্রোতাদের কাছে।

১৯২৩ সালে জন্মেছিলেন হোলুব, পিলসেন-এ, সদ্য ষাট পেরিয়েছেন, অথচ তাঁর 'পুরোপুরি খোলামেলা' এই কবিতাগুলোই সাক্ষী কেমন তারুণ্যময় তাঁর কল্পনা, কেমন সজাগর তাঁর চিন্তা। বাংলায় হোলুবকে উপস্থাপিত করতে পারা আমার শুধু সৌভাগ্যই নয়, গর্বেরও বিষয়। হোলুবের এই কবিতা থেকে এখনকার বাংলা কবিতাও অনেককিছু শিখতে পারবে ব'লে আমার বিশ্বাস।

...

এই অনুবাদগুলো গত বারো বছরে 'পরিচয়', 'হরবোলা', 'বিভাব', 'কালপুরুষ' ও 'স্পন্দন'-এ বেরিয়েছে। হোলুব বলেছিলেন, কবিতা হবে খবরকাগজ পড়ার মতো কিংবা হয়তো ফুটবল খেলা দেখতে যাবার মতো অভিজ্ঞতা : অনায়াস, প্রাত্যহিক, জরুরি—যেমন হয় ছোটোহাজরির টেবিলে খবরকাগজ ; অথবা যেমন হয় ফুটবলের মাঠে, বাইশ জনের দক্ষতা ও শিল্পিতায় ফেটে পড়ে বাইশ-হাজার বা তারও বেশি দর্শক—সে নিজে খেলে না বটে, কিন্তু জানে ও উপভোগ করে নৈপুণ্য ও কলাকৌশল, তার থাকে পক্ষপাত, প্রিয়দল, চেঁচিয়ে-ওঠা তারিফ অথবা উদ্দীপক উশকানি। এই বইয়ের কবিতাগুলো নিশ্চয়ই বুঝিয়ে দেবে হোলুবের এই ভাবনার পেছনকার শর্তগুলো কেমন এবং কতখানি সঠিক।